পিজ্জা
সমরেশজিৎ চক্রবর্তী

#পিৎজা (প্রথম কিস্তি)

১.

'ঝুঁটি বাঁধা কাকাতুয়া আয় না

ধরেছে খোকন সোনা বায়না'।

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

বাংলা পিডিএফ ডাউনলোডের জন্য ভিজিট করুন

boierpathshala.blogspot.com

boidownload.com

Facebook.com/bnebookspdf

♥♥বইটি ভালো লাগলে হার্ডকপি কিনুন।♥♥

আমরা কোন পিডিএফ তৈরি বা সংরক্ষণ করি না, শুধু ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা পিডিএফ শেয়ার করি।

অত্যন্ত পরিচিত সুর। অন্য কোনও সময় সুরটা শুনলে প্রিয়ম্ ভাবত, মায়ের মোবাইলে বাজছে। মায়ের মোবাইলে এমন অনেক সুন্দর সুন্দর গান শুনেছে সে। কিন্তু আজ বাজবে না। কারণ মা বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে আজ সকালেই মামাবাড়ি চলে গিয়েছে। প্রায়ই এমন হয়। মা বাবার মারধোরে অতিষ্ঠ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। আবার পরদিনই চলে আসে। প্রিয়ম্‌কেও নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু বাবা ছাড়ে না। প্রিয়মের মাথার চুল শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে। হিস্‌হিসিয়ে বলে—'এটাকে নিয়ে যাবি তো দুটোকেই শেষ করে দেব। তুই যাচ্ছিস্ যা! ওকে নিবি না!'

অগত্যা পরদিনই ফিরতে হয় মাকে। মা জানে প্রিয়ম্ মাকে ছাড়া ভীষণ অসহায়। গোটা একটা দিন তাকে কেউ খেতে দেবে না। কেউ স্নান করিয়ে দেবে না। কেউ যত্ন তো করবেই না, বরং বাবা মারধোর করতে পারে। তাই প্রত্যেকবারই ফিরে আসে।

শুধু মোবাইল নয়, রোজ মা নিজেও এমন ঘুমপাড়ানিয়া গান গেয়ে তাকে ঘুম পাড়ায়! কখনও ঝুঁটি বাঁধা কাকাতুয়া, কখনও বা জ্যাক অ্যান্ড জিল। একেকদিন একেকটা। যেদিন মা'র মন ভালো থাকে, বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে না—সেদিন কত কথা বলে। কত রাইম্‌স্ শোনায়। তখন এই গানটাও গায়—'ঝুঁটি বাঁধা কাকাতুয়া আয় না...'।

ভাবতেই প্রিয়মের মন খারাপ হয়ে যায়। বাবাটা যেন কী! মায়ের সঙ্গে কেন ঝগড়া করে লোকটা? মা কত সুন্দর, কত মিষ্টি। কেমন সুন্দর গান গায়! তা সত্ত্বেও বাবা সবসময় মায়ের সাথে ঝগড়া করছে! শুধু মা-ই কেন? প্রিয়ম্‌কেও বকে-ঝকে-মেরে একসা করে। ভাত খাওয়ার সময় দুষ্টুমি করলে আচমকা তার নরম গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দেয়! ফর্সা শীর্ণ ছ' বছরের ছেলেটার গালে দগদগ করে পাঁচ আঙুলের লাল ছাপ! একবার তো ভাতের থালাটাই ছুঁড়ে দিয়েছিল ওকে লক্ষ্য করে। থালাটার ধারালো কানা কপাল ছুঁয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। তারপর কী রক্ত! মা ওকে কোলে করে ছুটেছিল ডাক্তার আঙ্কেলের কাছে। চারটে স্টিচ পড়েছিল মাথায়!

মা এরপর বাবার সঙ্গে একমাস কথা বলেনি। শুধু সেদিনই কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল—'তুমি কি মানুষ?'

তারপর থেকেই সে বুঝতে পেরেছে, তার বাবা মানুষ নয়! এই যে বাড়িতে সাদা কাকাতুয়াটা 'লুঙ্গি ড্যান্স' গানটার সঙ্গে সবসময়ই লাফিয়ে লাফিয়ে নাচে, অথবা বিড়ালগুলো কথায় কথায় আঁচড় কাটে, কিংবা ঐ হাউন্ডটা দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে কামড়াতে আসে—বাবা ওদের মতই কিছু একটা! বাবাকে গানের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই নাচতে দেখেছে সে। দাঁত খিঁচুনিটাও গ্রে হাউন্ডের মতই। অতএব মা ঠিকই বলেছে। বাবা মানুষ নয়।

প্রিয়ম্ জানে তাকে কেন্দ্র করেই মা-বাবার অশান্তি। ঈশ্বরের এক নিষ্ঠুর রসিকতার দরুণ সে কথা বলতে পারে না! লোকে ওকে বোবা বলে। ও কিন্তু কানে সব শুনতে পায়। সব বুঝতে পারে। শুনতে পায় ডাক্তার আঙ্কেল বলছে, একটা ছোট্ট অপারেশন করলেই প্রিয়ম্ এই সোসাইটির বাকি সবার মত দিব্যি গড়গড়িয়ে কথা বলতে পারবে। ভাবতেই তার ছোট্ট দেহ অদ্ভুত শিহরণে ভরে যায়। সে ও ফ্ল্যাটের রিকু, পিঙ্কি, বুলুর মত সব কথা বলতে পারবে! কী বলবে প্রথমে প্রিয়ম্! কত কথাই তো রোজ তার কর্ণকুহরে উঁকি ঝুঁকি মেরে চলে যায়। তার মধ্যে কোন্‌টা বলবে? সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মা তার এই গোপন উত্তেজনা বুঝতে পারে। মিষ্টি হেসে বলে—প্রিয়ম্‌সোনা প্রথমে কী বলবে? মা, বাবা, কাকু, দাদু—কী বলবে?'

প্রিয়ম্ মনে মনে ভেবে নিয়েছে, অপারেশনের পর ডাক্তার আঙ্কেল যখন তাকে কথা বলতে বলবে তখন ও প্রথমেই একটা শব্দ বলবে। একটা কথাই উচ্চারণ করবে—'মা...মা...মা'।

এখন সারাদিন ধরে সে শুধু উৎকর্ণ হয়ে এক একটা শব্দ শুনে যায়। বা রে, ওকে সব কথা বলতে হবে না? মাকে গান শুনিয়ে তাক লাগিয়ে দিতে হবে না? তাই পৃথিবীর যত শব্দ, যত সুর কর্ণগোচর হয়, সব কিছু মস্তিষ্কে জমা করে প্রিয়ম্। ওপাশের ফ্ল্যাটের পেট মোটা আঙ্কেল আন্টিকে প্রায়ই বলে—'এরকম করলে ডিভোর্স দিয়ে দেব!' শুনে ভারি মজা পায়। ডিভোর্স কী? জুজুবুড়োর মত কিছু বুঝি? মা যেমন তাকে ভয় দেখায়—'দুষ্টুমি করলে জুজুবুড়ো এসে ধরবে', আঙ্কেল ও তেমন করে আন্টিকে ডিভোর্সের ভয় দেখায়। মা ও অবশ্য কখনও কখনও

boierpathshala.blogspot.com

বাবাকে অন্য একটা জুজুর ভয় দেখায়। সেই জুজুটার নাম আবার 'সেপারেশন'। সেপারেশন আর ডিভোর্সকে স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছে আছে প্রিয়মের। না জানি তারা কত বড় জুজু! সেপারেশনের জুজু অবশ্য ঝগড়ার প্রথমদিকে আসে না। প্রথমে শুধু চেঁচামেচি! প্রিয়ম্ শুনতে পায় মা চিৎকার করছে--

'নিজের এক পয়সা রোজগার করার মুরোদ নেই, আমার স্যালারির সবটা মদ খেয়ে, উৎকট উৎকট জীবজন্তু কিনে দুহাতে ওড়াও। বাড়িতে মানুষের চেয়ে জন্তু-জানোয়ার বেশি! সেগুলোর তদারকি করতেই প্রাণ যায়! দামি সিগারেট ছাড়া রোচে না বাবুর। আরও কী কী করো, কোথায় টাকা ওড়াও জানি না ভেবেছ?' বলতে বলতেই মা কেঁদে ফেলে—' প্রিয়মের কথা একবারও ভাববে না? ওর অপারেশন করার জন্য টাকা দরকার!'

বাবার নেশাজড়িত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—'বেশ করবো। আমার একটা স্টেটাস নেই? আর ঐ অপদার্থ ছেলেটাকে কি আমি বিইয়েছি? ডিফেক্টিভ মাল ডেলিভারি দেওয়ার সময় তোর মনে ছিল না? ও ছেলেকে কে পুষবে? তখনই বলেছিলাম টান মেরে জঞ্জালটাকে ফেলে দিয়ে আসি।'

মা স্তম্ভিত হয়ে যায়। ধরা গলায় বলে—'আ-স্তে! ও শুনতে পাবে!'

প্রিয়ম্ সব শুনতে পায়। কিন্তু সব কিছু বুঝতে পারে না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারে, তার আরেকনাম 'জঞ্জাল'। সে ঠোঁটদুটো ঈষৎ ফাঁক করে 'জঞ্জাল' শব্দটা উচ্চারণ করার চেষ্টা করে। যখন সে কথা বলতে পারবে, তখন কেউ তাকে নিকনেম জিজ্ঞাসা করলে বলবে—'আমার নিকনেম 'জঞ্জাল'।' কেমন মজা হবে তাই না?

'ঝুঁটিবাঁধা কাকাতুয়া আয় না/ ধরেছে খোকন সোনা বায়না/ ঝুঁটি বাঁধা কাকাতুয়া...!'

সুরটা আবার স্পষ্ট হয়ে কানে ধাক্কা দিল তার। নাঃ, গানটা কেউ গাইছে না। বরং করিডোরে দাঁড়িয়ে কেউ শিস দিচ্ছে। সিটি দিয়ে গানের সুরটাকে প্রকট করে তুলেছে। করিডোরের দেওয়ালে বারবার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠছে সুরটা। মা যখন গানটা গায়, তখন কী মিষ্টি লাগে শুনতে। অথচ শিসটা শুনতে মোটেই ভালো লাগছে না। উলটে প্রিয়মের গলার কাছটা শুকিয়ে ওঠে। ঘাড়ের কাছ শির্‌শির্ করে উঠল। এখন সুরটা শুনে ও ভয় পাচ্ছে। কেমন অদ্ভুত একটা ভয়! এই সিটি দেওয়া কখন বন্ধ হবে? গানটার কথা না থাকলে শুধু সুরটা এমন ভয়ঙ্কর তা ও আগে জানত না!

কয়েকমুহূর্ত নিস্তব্ধতা। পরক্ষণেই প্রিয়ম্‌দের বাড়ির কলিংবেল বেজে ওঠে! কে এল? মা নাকি? কিন্তু মা তো এতরাতে আসবে না। ঘড়ির দিকে তাকায় প্রিয়ম্। ঘড়ির দুটো কাঁটাই বারোটায় হাত দুটো জমিয়ে রেখেছে। মা ওকে অল্পস্বল্প ঘড়ি দেখতে শিখিয়েছে। প্রিয়ম্ বুঝল রাত বারোটা বাজে! এতরাতে কে এল?

ভাবতে না ভাবতেই আবার কলিংবেলের অধৈর্য আওয়াজ। প্রিয়ম্ নিজের ঘরের দরজা আলতো করে খুলে আলগোছে চোখ রাখে বাইরের ঘরে। মনের ভেতর অদম্য কৌতুহল। কে এল? মা নয়তো?

'কা-মিং'।

বাবার গলার আওয়াজ। যথারীতি স্খলিত স্বর! মদ্যপানের চূড়ান্ত অবস্থায় আছেন ভদ্রলোক। কোনমতে টলতে টলতে গিয়ে দরজা খুললেন তিনি। অপর প্রান্তে কালো হেলমেট পরা এক ব্যক্তি। গায়ে লেদার জ্যাকেট। পিঠে স্কুলব্যাগের মত ব্যাকপ্যাক। হাতে কী যেন ধরা।

'কে-এ?' নেশাজড়িত কন্ঠে বললেন প্রিয়মের বাবা।

'পিৎজা ডেলিভারি বয় স্যার'। আগন্তুক হেলমেটটা তখনও খোলেনি। হেলমেটের ভিতর থেকে ভেসে এল কেমন যেন যান্ত্রিক কড়কড়ে আওয়াজ। যেন একটা রোবট কথা বলছে—

boierpathshala.blogspot.com

‘আপনাদের পিৎজা! প্যান পিৎজা উইথ মোজারেলা চিজ টপিংস! রুপিজ টু হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইন্টি ফাইভ ইন টোট্যাল স্যার।’

‘হোয়াট দ্য হেল!’ তিনি রক্তচক্ষুতে মেপে নিলেন আগন্তুককে। যেন এখনই তাকে ঘাড়ধাক্কা দেবেন কিনা ভেবে নিলেন। পরক্ষণেই চোখদুটো ফিরল প্রিয়মের ঘরের দিকে। একেবারে চোখ পড়ল দরজার ফাঁকে উঁকি মারা ভয়ার্ত চোখ দুটোর দিকে!

‘ইউ লিট্‌ল বাস্টার্ড!’ যেন একটা গ্রে হাউন্ড চিৎকার করে উঠল। ভদ্রলোক প্রায় তেড়ে এলেন তার দিকে—‘এসব কী? রাত বারোটায় পিৎজা খাওয়ার শখ হয়েছে! ফাজলামি? এখন এর পয়সা কি তোর মা দেবে?’

প্রিয়ম্ ত্রাসে বিছানার নীচে লুকোতে চায়। কিন্তু তার বাবা একহাতে মাথার চুল মুঠো করে ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনেছেন তাকে। যন্ত্রণায় চোখে জল এসে যায় শিশুটির। অসহায়, জল ভরা চোখে করুণ মিনতি নিয়ে তাকিয়ে থাকে সে বাবার দিকে। এসব পিৎজার অর্ডার ফোনে দিতে হয়। এবং ফোনে পিৎজার অর্ডার দিতে গেলে যে কন্ঠস্বরের প্রয়োজন, তা কি এই বন্য-উন্মত্ত লোকটার মাথায় ঢুকবে?

‘বাচ্চাটাকে মারবেন না স্যার’।

আগন্তুকের হেলমেটের তলা দিয়ে ফের বেরিয়ে এল কয়েকটা শব্দ।

‘মারব না তো কী পুজো করব? শালা, শুয়োরের বাচ্চার নোলা দ্যাখো! পি-ৎ-জা খাবি? পি-ৎ-জা?’ একটা পেল্লায় থাপ্পড়ে প্রিয়ম্‌কে মেঝের ওপর আছড়ে ফেলেছেন তিনি। প্রিয়মের ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছে! সে দু হাত জোড় করে ফেলেছে...! আরও কয়েকটা ঘুঁষি, লাথি মুড়ি মিছরির মত এসে পড়ল তার ওপরে! তলপেটে অসহ্য যন্ত্রণা। প্রিয়মের চোখের সামনে সব ঝান্সা! শুধু শুনতে পেল আগন্তুক এবার জোরালো ইস্পাত স্বরে বলল—‘বাচ্চাকে মারবেন না’।

‘আবে তুই কে রে?’ তিনি এবার ডেলিভারি বয়ের দিকে তাকান—‘আমার ছেলে—আমি মারব, কাটব—যা খুশি করব, তুই কোন্ শালার বাচ্চা...?’

প্রিয়ম্ শুনতে পেল আর কিছু বলার আগেই বন্য শুয়োরের মত চিৎকার করে উঠল বাবা! সে ভয় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখল ডেলিভারি বয় একটা ধারালো কিছু দিয়ে কোপের পর কোপ বসাচ্ছে তার বাবার ওপর! বাবা চিৎকার করছে...রক্ত পড়ছে ফিনকি দিয়ে...! তার মৃত্যুযন্ত্রণাময় আর্তনাদ রাতের নিস্তব্ধতাকে চিরে-ফেঁড়ে ফালাফালা করে দিল। প্রতিবেশীরা লাফিয়ে উঠল ঘুম থেকে। প্রিয়মের বাবার পোষা কুকুরগুলো একসঙ্গে গর্জন করে উঠল! পাশবিক চেষ্টায় চেইন ধরে টানাটানি করছে তারা। কিন্তু কিছুতেই নিজেকে ছাড়াতে পারছে না! ব্যর্থ আক্রোশে হিংস্র দন্ত পংক্তি দেখিয়ে গর্জন করছে। দাঁড়ে বসা কাকাতুয়া, ময়না, বদরিকা পাখিরা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে! বেড়ালগুলো প্রাণপণে আশ্রয় খুঁজছে... যেন মানুষ নয়, তাদের সামনে কোনও রাক্ষস তান্ডব করছে। আশেপাশের ফ্ল্যাটের আলোগুলো দপ্‌দপ্ করে জ্বলে উঠেছে... থলথলে ভুঁড়িওয়ালা সিকিউরিটি ছুটেছে ওদিকেই...! ওদিকে লিফ্‌ট্‌ও কাজ করছে না আজ সকাল থেকে...!

বিতস্তা হাইটসের গুচ্ছ সিঁড়ি ভেঙে উঠে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে পৌঁছতে প্রায় সাত-আট মিনিট লেগে গেল সবার! কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। প্রিয়মের বাবা নিস্পন্দ, নিথর হয়ে পড়েছিলেন মেঝের ওপরে। সারাদেহে অগুনতি কোপের ক্ষত চিহ্ন! ক্ষত বেয়ে তখনও তাজা রক্ত বেরোচ্ছে!

বাবার মৃতদেহের সামনেই স্তম্ভিত হিমবাহের মত বসেছিল প্রিয়ম্। সে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছে না, শুনতে পাচ্ছে না! দর্‌দর্ করে ঘামছে বাচ্চাটা। নিঃশ্বাসও পড়ছে কি না বোঝা যায় না! হাতে একটা প্রমাণ সাইজের ভোজালি ধরা! ভোজালি থেকে তখনও তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে...! আর তার সামনে কে যেন একটা পিৎজার বাক্স রেখে

boierpathshala.blogspot.com

গিয়েছে। খালি নয়, ভর্তি বাক্স! তার ফাঁক দিয়ে তখনও উঁকি মারছে প্যান পিৎজা উইথ মোজারেলা চিজ টপিংস!

বিস্মিত চোখগুলো এবার আবিষ্কার করল মৃতদেহের ঠিক পাশের দেওয়ালেই কে যেন রক্ত দিয়ে বড় বড় করে লিখে দিয়েছে—'হেট ইউ বাবা!'

২.

'ওয়েলকাম টু জাঙ্গ্‌ল্‌'।

ফ্ল্যাটের দরজা খুলেই ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডঃ অসীম চ্যাটার্জী অধিরাজকে স্বাগত সম্ভাষণ জানালেন।

অধিরাজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তখন বিতস্তা হাইট্‌সের নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটটাকে মেপে নিচ্ছিল। বাইরের ঘরে হলুদ রঙের পুলিশ-টেপ দিয়ে চতুর্দিক ঘিরে দেওয়া হয়েছে। হলুদ ফিতের গায়ে জ্বলজ্বল করছে সাবধানবাণী, 'ক্রাইম সিন—ডু নট্‌ ক্রস'। বাচ্চাটা এখন ভিতরের ঘরে 'থ' হয়ে বসে আছে। তবে এই মুহূর্তে তার হাতে ভোজালিটা নেই। অর্নব ওটা এভিডেন্স ব্যাগে পুরে ফেলেছে। কাল রাতেই খবর পেয়ে বাচ্চার মা চলে এসেছেন। শিশুটিকে জড়িয়ে ধরে তিনিও চুপচাপ বসে আছেন। দুজনের কারোর দেহেই যেন প্রাণ নেই! মা কাঁদছেন না। বরং বুকের ভেতরে সন্তানকে ধরে সর্বংসহা ধরিত্রীর মত স্থির হয়ে আছেন।

অধিরাজ পিৎজার বাক্স ও রক্তাক্ত ভোজালিটার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে। দেওয়াল লিখনের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক স্বরে বলল—'জাঙ্গল্‌! শহরের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা অন্যতম সেরা এই টাওয়ারটাকে আপনার জঙ্গল মনে হচ্ছে!'

'নয়তো কী?' ডঃ চ্যাটার্জীর বিরক্তিতিক্ত উত্তর—'ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই এদিকে কাকাতুয়া ডাকছে, অন্যদিকে টিয়া, ময়না হুলুস্থুলু লাগিয়ে রেখেছে। মাথার ওপর ইজিপশিয়ান মাও 'ম্যাঁও ম্যাঁও' করছে! ওদিকে চিনে বিড়াল ড্রাগন লি ড্রাগনের মত থাবা গেড়ে বসে আছে...!'

'লি হুয়া মাউ?'

'কী?' ডঃ চ্যাটার্জী স্রেফ জ্বলে গেলেন! তার কান দিয়ে যেন ভুশ করে একচোট ধোঁয়া বেরিয়ে গেল—'হাঁউ মাউ? আমি হাঁউমাউ করছি!'

'ওঃ!' সে হেসে ফেলল—'সব কিছুতেই আপনি যে করেই হোক্‌ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের রচনাই লিখবেন! হাঁউমাউ নয়! লি হুয়া মাউ। ড্রাগন লি'র চাইনিজ নাম!'

'তোমাকে এখন চাইনিজ আওড়াতে কে বলেছে?' তিনি গজর গজর করছেন—'এদিকে আমি মরছি আমার জ্বালায়! নাকের ওপর কাবলি বিড়ালের লেজ ঝুলছে! ওদিকে প্রমাণ সাইজের অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে পিরান্‌হা দাঁত খিঁচিয়ে কামড়াবার তাল করছে! পঞ্চাশটা কুকুর তারস্বরে এমন ডাকাডাকি শুরু করেছে যে তাদের জ্বালায় টাকে চুল গজিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল! এটা বাড়ি, না আমাজনের জঙ্গল! শুধু অ্যানাকোন্ডাটাই যা বাকি আছে!'

'আপনি শিওর যে অ্যানাকোন্ডা নেই?' অধিরাজ মৃদু মৃদু হাসছে—'যদ্দূর মনে পড়ছে ঢোকার সময়েই একটা অ্যানাকোন্ডা আমাকে ওয়েলকাম জানাল!'

'মানে?'

ডঃ চ্যাটার্জী এমন ভ্রূকুটি করলেন যে মনে হল ভুরু নয়, তার কপালের ওপরে সত্যিই একজোড়া অ্যানাকোন্ডা

boierpathshala.blogspot.com

কুন্ডলী পাকাল—'কায়দা করে আমাকে অ্যানাকোন্ডা বলা হচ্ছে?'

'সেরকম বলেছি কি?' বলতে বলতেই ফের লাশের দিকে চোখ ফিরিয়েছে অধিরাজ—'এদিককার খবর কি?'

'খবর নেই'। ডঃ চ্যাটার্জী হাতের গ্লাভ্স খুলতে খুলতে বললেন—'যা যা থাকার দরকার ছিল প্রাথমিক ভাবে তার কোনটাই দেখছি না। গত একঘন্টা ধরে দরজার হ্যান্ড্লে, ঘরে, দেওয়ালে, এমনকি পিৎজা বক্সেও ডাস্টিং কিট্ দিয়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজছি। নো ফিঙ্গারপ্রিন্টস্, নো এভিডেন্স'!

'ভোজালির বাঁটে?'

'নাঃ। শুধু বাচ্চাটার ফিঙ্গারপ্রিন্ট!' ডঃ চ্যাটার্জী জানান—'তবে ছাপটা অ্যান্টিক্লকওয়াইজ নয়, ক্লকওয়াইজ। ছুরি মারতে হলে ছুরিটাকে যেভাবে ধরা উচিত, তাতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যান্টিক্লকওয়াইজ হওয়া উচিত। কিন্তু এখানে উল্টোটা। অর্থাৎ বাচ্চাটি স্ট্যাব করেনি। বরং ভোজালিটা টেনে বের করেছে। তবে আপাতত যতটুকু বলতে পারি মার্ডারার রাইট হ্যান্ডার। এলোপাথাড়ি বারোটা স্ট্যাব করেছে। কিন্তু ডেডবডির ডানদিকের ক্ষতগুলোর চেয়ে বাঁদিকের ক্ষতগুলো ফ্যাটাল বেশি। অনেক বেশি গভীর'।

'মার্ডার ওয়েপ্ন্ তবে ভোজালিটাই?'

'সন্দেহই নেই। আমি উন্ডের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি। ভোজালিটা দিয়েই খুন হয়েছে। পরে অবশ্য শিওর হওয়ার জন্য ওয়েপ্নের ওপরের ব্লাডটাও মিলিয়ে দেখব'।

' আর ডেডবডি?' সে জিজ্ঞাসা করে—'লাশ থেকে কিছু পেলেন?'

ডঃ চ্যাটার্জী মাথা নাড়লেন—'সেখানেও যা থাকার কথা ছিল কিছুই নেই! লোকটা আর যাই হোক্, মানুষ নয়!'

'মানে?'

'মানে মানুষ হতে গেলে দৈহিক কিছু লক্ষণ থাকা উচিত। এ লোকটার পেট নেই, পাছা নেই। পুরো সরলরেখা। যেন এইমাত্র তাসের দেশ থেকে হরতনের এক্কা উঠে এসেছে! একেবারে যাকে বলে নিখাউন্তির বাপ! একে চিমসে, তার ওপর আকন্ঠ মাতাল। কোনরকম প্রতিরোধই হয়নি। খুনি ফাঁকা মাঠে এক ডজন গোল করে বেরিয়ে গিয়েছে।'

'নিখাউন্তি! না নিয়েৎ!' সে বিস্মিত—'রাশিয়ান ভাষা বলছেন নাকি?'

'উঁহু'। ডঃ চ্যাটার্জী বললেন—'তুমি একাই চাইনিজ আওড়াবে? আমি আমাজনের ভাষা বলছি! ঝিঙ্গা লালা হু...ঝিঙ্গা লালা হু-উ-উ! রেড ইন্ডিয়ান, জুলুরা এই ভাষায় কথা বলে। আমাকে অ্যানাকোন্ডা বলা!'

অধিরাজ এই পরিস্থিতিতেও না হেসে পারল না—'অসময়ে ভোর রাতে ঘুম ভাঙলে সবাই মাতৃভাষাতেই কথা বলে! এ আর আশ্চর্য কী!'

'নিখাউন্তি বিশুদ্ধ বাঙাল ভাষা হে পন্ডিতপ্রবর!' তিনি দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলেন—'এর মানে যারা খায় না বা খেতে চায় না! এই লোকটিও কিছু খায় দায় বলে মনে হয় না! বরং লাশের গা থেকে যে পরিমাণ উৎকট গন্ধ পাচ্ছি, তাতে পোস্টমর্টেমের আগেই বলে দিতে পারি—ওর পাকস্থলীতে খাবারের থেকে অ্যালকোহল বেশি পাওয়া যাবে। চিমসে গায়ে রক্তও তেমন নেই। যতটা রক্তপাত হওয়া উচিত ছিল, হয়নি। বারোবার স্ট্যাবড্ হয়েছে। ইন দ্যাট কেস রক্তে রক্তে ছয়লাপ হওয়া উচিত ছিল। অথচ আশ্চর্যের বিষয় ক্ষতগুলো ছাড়া মেঝেতে তেমন রক্ত নেই!'

'রক্ত নেই? না মুছে দেওয়া হয়েছে?' সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়—'ল্যুমিনল টেস্ট করে দেখেছেন?'

boierpathshala.blogspot.com

‘না। করিনি। তবে সম্ভাবনাটা আমারও মাথায় এসেছে’। ডঃ চ্যাটার্জী আবার গ্লাভ্স পরে নিয়েছেন—‘ল্যুমিনল টেস্ট করতেই যাচ্ছিলাম, তার আগেই তুমি এসে পড়লে। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করো। এখনই জানিয়ে দিচ্ছি রক্ত মুছে দেওয়া হয়েছে কিনা। তবে রাজা, লোকটার চরিত্র যা শুনলাম, তাতে বুঝলাম চরিত্র নামক বস্তুটাও ওর ছিল না। লোকটা কোনওদিক দিয়েই মানুষ নয়। প্রতিবেশীদের মুখে যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে, খুনীকে না ধরে ওকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া উচিত!’

‘অবশ্যই আমরা নোবেলের জন্য সুপারিশ করব’। অধিরাজ সম্মতিসূচক ভাবে মাথা ঝাঁকায়—‘কিন্তু তার আগে জানা দরকার এই উপকারী লোকটি কে!’

‘বেশ!’ ফরেনসিক এক্সপার্ট আর কথা না বাড়িয়ে কাজে চলে গেলেন। অধিরাজ আবার দেওয়ালের লেখাটার দিকে মনোযোগ দিল। লাল রক্তে কেউ বড় বড় করে লিখে রেখেছে—‘হেট ইউ বাবা’। বাচ্চা ছেলেটা এটা লিখতেই পারে না। যে উচ্চতায় লেখাটা আছে, অত উঁচুতে ওর হাত পৌঁছবেই না। তবে কে লিখল? খুনী? দেখতে দেখতেই তার কপালে ভাঁজ পড়েছে। এ কথাগুলোর মানে কী? লোকটা সঙ্গে ভোজালি এনেছিল। তার মানে পিৎজা ডেলিভারি বয়ের ছদ্মবেশে খুন করার উদ্দেশ্যেই এসেছিল! কিন্তু এত লোক থাকতে প্রিয়মের বাবাকেই বেছে নিল কেন? হত্যার উদ্দেশ্য কী? লুট-পাট? খুনী হয়তো জানত এ বাড়িতে একটা মদ্যপ লোক আর একটা বোবা বাচ্চাছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ‘হেট ইউ বাবা’ শব্দটা লিখল কেন?

অধিরাজ দেওয়াল লিখনের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তার মাথায় তখন নানারকম অঙ্ক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সচরাচর দেওয়ালে বা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে হলে লোকে নিজের চোখের সমান উচ্চতায় সমান্তরালে লেখে। সেক্ষেত্রে খুনীর উচ্চতা পাঁচ ফুট ন’ ইঞ্চি থেকে পাঁচ দশের মধ্যে হওয়া উচিত।

‘স্যার...!’

অর্নবের ডাকে সম্বিত ফিরল অধিরাজের। অর্নব এতক্ষণ ভেতরের ঘরে সবাইকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। এখন বেরিয়ে এসেছে। অধিরাজ তখনও দেওয়ালের শব্দগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। শব্দগুলোর মাথামুন্ডু কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না! ‘হেট ইউ বাবা’ কথাটার অর্থ কী? কোন্ বাবার কথা বলা হচ্ছে? প্রিয়মের বাবা কি? প্রিয়মের বাবাকে খুনী আচমকা ‘বাবা’ বলতে যাবে কেন? সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। খুনী কি তদন্তকে অন্য পথে ঘুরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে কথাগুলো লিখেছে? না অন্যকিছু? এমন কিছু যা এখনও বোঝা যাচ্ছে না!

‘বলো’। সে চোখ সরিয়ে নিয়ে অর্নবের দিকে তাকায়—‘ প্রিলিমিনারি জিজ্ঞাসাবাদ করে মোটিভ কিছু বুঝলে?’

‘স্যার...’ অর্নব গলা খাঁকারি দেয়—‘ভিক্টিমের নাম রঞ্জিত বসু। তবে খুনটা আর যাই হোক্, লুটপাটের কেস নয়। খুনী আলমারি ছুঁয়েও দেখেনি। অথচ আলমারিতে কয়েক লাখ টাকার গয়না আর হাজার পঞ্চাশেক ক্যাশ ছিল। দামি ল্যাপটপ, টিভি, মোবাইল—কিছুই স্পর্শ করেনি। সারা বাড়িতে কোথাও কিছু মিসিং নয়! কিলার স্রেফ লোকটাকে খুন করে বেরিয়ে গিয়েছে। কাল লিফ্ট্ চলছিল না। চিৎকারের আওয়াজ শুনে কয়েকজন নে’বার আর সিকিউরিটি ছুটে এসেছিল। কিন্তু সাত-আট মিনিট সময় লেগেছিল ওদের। তার মধ্যেই বেরিয়ে গিয়েছে খুনী’।

‘হুঁ!’ সে ধীরে ধীরে বলল-- ‘কিন্তু বেরিয়ে গেল কোন্ দিক দিয়ে? লিফ্ট্ চলছিল না। অন্যদিকে সিঁড়ি দিয়ে সিকিউরিটি আর অন্যান্য লোকেরা উপরে উঠে আসছিল। এতগুলো লোকের মাঝখান দিয়ে ভ্যানিশ হয়ে গেল কী করে? অন্তত কেউ তো তাকে ওপর থেকে নামতে দেখে থাকবে!’

‘কেউ দেখেনি স্যার। প্রিয়ম্দের ফ্লোরে ওরা একাই থাকত। বাকি দুটো ফ্ল্যাট ফাঁকা পড়ে আছে। এই ফ্লোরের একটা ফ্ল্যাটেও সিসিটিভি নেই। তাই খুনীকেও দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা কম ’। অর্নবের সপ্রতিভ জবাব—‘ তাছাড়া এই স্টেয়ার কেস ছাড়াও পিছনের দিকে আরেকটা ঘোরানো রেলিঙের লোহার সিঁড়ি আছে।

boierpathshala.blogspot.com

ফায়ার এক্সিট। খুনী সম্ভবত ওখান দিয়েই পালিয়েছে'।

' 'সম্ভবত' শব্দটা যথেষ্ট সন্তোষজনক নয় অর্নব। শিওর হওয়া দরকার! পুলিশ কুকুর নিয়ে আসতে বলো। খুন যেভাবে হয়েছে, তাতে খুনীর গায়ে বা জুতোতে রক্ত লাগা স্বাভাবিক। খুনীর হাতে রক্ত তো ছিলই, নয়তো গ্রাফিটিটা লিখল কী করে! পুলিশ স্নিফার ডগ শিওর শট্ রক্তের গন্ধ ধরবে । ওরাও যদি ফায়ার এক্সিটের দিকে দৌড়য়, তবে বুঝব খুনী ওদিক দিয়েই পালিয়েছে'।

'ওকে স্যার'।

অধিরাজ কয়েকমুহূর্ত ভাবে। ক্যাশ টাকা, গয়না, মোবাইল, ল্যাপটপ যখন ছোঁয়নি তখন আর যাই হোক্ এটা ডাকাতির জন্য খুন নয়। তবে? ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা? কিংবা অন্য কোনও স্বার্থ?

'ভিক্টিম খুব একটা সুবিধের লোক ছিল না স্যার'। অর্নব জানায়—'খোঁজখবর করে যা জানলাম তাতে স্বভাবগত ভাবেই খেঁকুটে। একটা হোটেলের বিজনেস করত বটে, কিন্তু সেটাও বন্ধ হওয়ার পথে। মদ খাওয়া, রেস খেলা, বান্ধবীদের পেছনে সব টাকা ওড়াত। সেই নিয়ে পার্টনারের সঙ্গে একচোট ফাটাফাটিও হয়ে গিয়েছিল। পার্টনার নাকি প্রাণের হুমকি দিয়েছিল। সাসপেক্ট লিস্টে তার নামই সবার ওপরে। তা ছাড়াও অনেকের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে আর ফেরত দেয়নি। তারাও বাড়ি বয়ে এসে হুমকি দিতে ছাড়েনি—এদের মধ্যে যে কেউ রিভেঞ্জ নিতে খুন করতে পারে স্যার'।

'অথবা করাতে পারে। খোঁজ নিতে হবে এই লোকগুলোর মধ্যে কেউ হিস্ট্রিশিটার আছে কি না! ভদ্রলোকের পার্টনার বা ধার দেওয়া লোকগুলোর মধ্যে কারোর অতীতে অপরাধের রেকর্ড আছে কি না সেটা জেনেছ?'

'আছে স্যার'। অর্নবের সপ্রতিভ উত্তর—'ওর পার্টনার শিবু দাস একসময়ে জমির দালালি করত। প্রোমোটারির ব্যবসাও আছে। লোকে বলে তার নাকি কিছু সমাজবিরোধীদের সঙ্গে লিঙ্ক রয়েছে। অন্তত লোকটার কিছু পোষা গুন্ডা আছে'।

'বাকিরা?'

'সবাই ধোওয়া তুলসীপাতা নয়। বিশেষ করে ভিক্টিমের সঙ্গে এক গেলাসের ইয়ার ছিল ফাটা তুবড়ি। তার টাকাও হজম করে নিয়েছিল ভিক্টিম'।

'ফাটা তুবড়ি! মানে বিখ্যাত লোক্যাল গুন্ডা! অন্তত এক ডজন মার্ডার, কিডন্যাপ আর একস্টর্শনের কেস চলছে ওর ওপর!' অধিরাজের মনোযোগ আবার গিয়ে পড়েছে দেওয়াল লিখনের দিকে—'আর কিছু?'

'বাইরের লোকের সঙ্গে তো হাতাহাতি ছিলই, এমনকি বাড়ির লোককেও অতিষ্ঠ করে রেখেছিল'। সে বলল—'বোবা ছেলেটাকে প্রায়ই মারধোর করত। মিসেসের গায়েও কথায় কথায় হাত তুলত। মিসেস একটা কর্পোরেট কোম্পানিতে ভালো পজিশনে আছেন। তার টাকাপয়সাও কেড়ে নিয়ে মদ খেত'। বলতে বলতেই কণ্ঠস্বর নীচু হয়ে যায় তার—'কিছুই বলা যায় না স্যার। মিসেস নিজে না হোক্, অন্য কাউকে দিয়ে খুন করাতে পারেন। হয়তো ভেবেছেন, দুষ্টু গরুর থেকে শূন্য গোয়াল ভালো'।

'চমৎকার!' অধিরাজ বিড়বিড় করে—'এমন নির্লজ্জ চরিত্র এতদিন কেন খুন হয়নি সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের! সবক'টা অ্যাঙ্গেলই খতিয়ে দেখতে হবে অর্নব। তবে মনে হয় আপাতত পাওনাদারদের অ্যাঙ্গেলটা ছাড়তে পারো। যদি তাদের কেউ খুন করত তবে হাতের কাছে জুয়েলারি, টাকা, মোবাইল, ল্যাপটপ ছেড়ে রেখে যেত না। যতদূর মনে হয় টাকার জন্য খুনটা হয়নি। ফাটা তুবড়িকেও প্রাইম সাসপেক্টের লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া যায়'।

'কেন?' অর্নব অবাক।

boierpathshala.blogspot.com

‘ঐ গ্রাফিটিটা দেখেছ?’ সে দেওয়াল লিখনের দিকে ইঙ্গিত করে—‘তুবড়ি আদৌ এত শিক্ষিত নয় যে ইংলিশে গ্রাফিটি লিখবে! এ বি সি ডি আর চাইনিজ ভাষা—দুটোই ওর কাছে সমান। তাছাড়া ‘হেট ইউ বাবা’র ‘হেট’ আর ‘ইউ’ শব্দটা দেখো। ওয়াই ও ইউ দিয়ে ‘ইউ’ লেখা হয়নি। শুধু ভাওয়েল ‘ইউ’ বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ‘হেট’ ‘এইচ এ টি ই’ নয়, বরং ‘এইচ এইট’! এর মানে বোঝো?’

‘স্যার?’

অধিরাজ অন্যমনস্ক ভাবে সিগারেট ধরায়—‘এর মানে গ্রাফিটিটা যিনি লিখেছেন তিনি শর্ট ফর্মে লিখতে অভ্যস্ত। যেমন ফেসবুক, হোয়াট্স্ অ্যাপ, বা মেসেজ টেক্সটে লেখা হয়। ‘হোয়াই’কে ‘ওয়াই’ লেটারটা দিয়ে বোঝানো হয়। কিংবা ‘গ্রেট’কে ‘জি আর এইট’। তেমনই ‘হেট’ ‘এইচ এইট’। ‘ইউ’ শব্দটাকে ‘ইউ’ ভাওয়েল দিয়ে রিপ্লেস করা হয়েছে। তুমি কি ভাবতে পারো যে একটা লোক্যাল অশিক্ষিত গুন্ডা ফেসবুক বা হোয়াট্স্ অ্যাপের ভাষা লিখছে!’

অর্নবের মাথায় বিদ্যুৎ চমকে ওঠে। আশ্চর্য পয়েন্টটা ধরেছেন তো স্যার!

‘এটা যিনিই করে থাকুন অর্নব, তিনি রীতিমত শিক্ষিত। অন্তত ইন্টারনেট সার্ফিং এবং মোবাইলের মেসেজ লেখার অভ্যাস তার আছে’। অধিরাজ নাক দিয়ে গলগল করে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ে—‘তারপর ধরো যদি সুপারি কিলার হয়, তবে বাচ্চাটাকে ছাড়ল কেন? বাচ্চাটা কথা বলতে পারেনা ঠিকই, কিন্তু চোখে দেখতে বা কানে শুনতে পায়। সুতরাং সে পুলিশের কাছে রীতিমত স্ট্রং একজন প্রত্যক্ষদর্শী। খুনীকে সে দেখেছে। এরকম জলজ্যান্ত একজন সাক্ষীকে আস্ত রেখে যাওয়ার ভুল কি কোনও ভাড়াটে খুনী করবে! অথচ ছেলেটার গায়ে একটা আঁচড়ও পড়েনি। উপরন্তু তাকে একবাক্স পিৎজা দিয়ে গিয়েছে! আজ পর্যন্ত কোনও কিলারকে স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শীকে পিৎজা গিফ্ট্ দিতে শুনেছ!’

অর্নব চিন্তায় পড়ে। সত্যিই যুক্তিগুলোয় ধার আছে। যে লোক কাউকে বারোবার ভোজালির কোপ মেরে খুন করছে, সেই চরম নিষ্ঠুর খুনীই আবার একটি শিশুকে তার প্রিয় প্যান পিৎজা উপহার দিয়ে চলে যাচ্ছে! সে একজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হওয়া সত্ত্বেও খুনী তাকে ছেড়ে দিল! আশ্চর্য! সত্যিই আশ্চর্য!

সে কিছুক্ষণ একমনে চুপচাপ সিগারেটে বড় বড় টান মারল। তারপর সিগারেটের বাট্টা জানলার বাইরে ফেলে দিয়ে বলল—‘চলো, আমাদের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীকে দেখে আসি’।

‘আসুন’।

প্রিয়মের মা রুমা বসু তখনও ছেলেকে জড়িয়ে ধরে বসে আছেন। অধিরাজকে ঢুকতে দেখে তার মোমের মত অচ্ছাভ মুখে সামান্য যেন রক্তসঞ্চার হল। চোখের শূন্যদৃষ্টি সামান্য সজাগ। প্রিয়ম্ মায়ের বুকে মুখ গুঁজে চুপ করে আছে। অধিরাজ ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখল। ছেলেটা যেন রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছে! ঠোঁটজোড়া মাঝেমধ্যে অল্প অল্প কাঁপে। হয়তো একটা ভয়ার্ত কান্না তার গলা পর্যন্ত এসে ধাক্কা মেরে চলে যাচ্ছে।

‘আপনি কি প্রিয়ম্‌কে এখনই...! ও এখনও ট্রমাটাইজ্‌ড্ হয়ে আছে!’

রুমার কন্ঠস্বরে স্পষ্ট শঙ্কা। অধিরাজ শান্ত ভাবে ইশারায় তাকে আশ্বস্ত করে—‘ম্যাডাম, আমি কোনও প্রেশার দেব না। জাস্ট রুটিন এনকোয়ারি। কয়েকটা কথা বলার আছে’।

‘কিন্তু...!’

‘প্লিজ ম্যাম্’। সে বিনীত অথচ দৃঢ় স্বরে বলে—‘ভরসা রাখুন। আমি এমন কিছু বলব বা করব না, যাতে বাচ্চাটা ভয় পায়’।

boierpathshala.blogspot.com

‘ওকে’।

‘থ্যাঙ্কস।’ অধিরাজ এবার হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে পড়েছে। বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে খুব নরম সুরে বলল--‘বাবা, তুমি কি পিৎজা খেতে ভালোবাসো? কোন্ পিৎজা ভালো লাগে? আমার তো বার্গার খুব পছন্দ...!’

অর্নব সরু চোখে গোটা ব্যাপারটাই লক্ষ্য করছিল। এমনিতেই স্যার বাচ্চাদের সাথে খুব সহজে মিশে যেতে পারেন। প্রিয়ম্ প্রথমদিকে বেশ ভয়ার্ত ও আড়ষ্ট ছিল। কোনও কথারই উত্তর দিচ্ছিল না। অধিরাজের উল্টোপাল্টা বকবকানিতে, পিৎজা-বার্গারের আলোচনায়, বার্বি-ডলের বাড়ির গল্পে এবং শিন্‌চ্যান আর ডোরেমনের গল্পে একটু যেন সহজ হল। কিছুক্ষণ পরেই অল্প অল্প করে মাথা নেড়ে নেড়ে ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’য় উত্তর দিতে শুরু করল সে।

‘আচ্ছা বাবুসোনা...’। অধিরাজ এবার আস্তে আস্তে তদন্তের মূল স্রোতে ফেরাতে চাইল তাকে—‘তুমি কাল রাতে যে পিৎজা আঙ্কেলকে দেখেছিলে, তাকে মনে আছে?’

প্রিয়মের চোখে ভয়ের ছাপ পড়ল। সে মাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছে। রুমা আতঙ্কিত দৃষ্টিতে একবার অধিরাজের দিকে, একবার প্রিয়মের দিকে তাকাচ্ছেন! অধিরাজ তখনও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত সব স্থির। তারপরই প্রিয়ম্ আস্তে আস্তে আঙুল তুলে তার খেলনার বাক্সের দিকে ইশারা করল। সেখানে ছোট ছোট টয়-ফিগারিন, অর্থাৎ কার্টুনের হিরোর পুতুল সাজানো। ব্যাটম্যান, স্পাইডারম্যানের পুতুল সহ, ডোরেমন, নোবিতা, আয়রন ম্যান, টম অ্যান্ড জেরি, ক্যাপ্টেন আমেরিকা, হেলমেট পাওয়ার রেঞ্জার—কে নেই সেখানে!

অধিরাজের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। প্রিয়মের অঙ্গুলিনির্দেশ লক্ষ্য করে সে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। অর্নব এই উত্তেজনার কারণ বুঝতে পারে না। সে স্যারের কাছে ফিসফিস করে জানতে চায়—‘কী বলছে বাচ্চাটা! স্পাইডারম্যান বা ডোরেমন এসেছিল কাল রাতে?’

‘না অর্নব...’। তার চোখ চকচক করে ওঠে—‘ও যে ক্যারেক্টারটার দিকে ইশারা করছে সেটা স্পাইডারম্যান বা ডোরেমন নয়। ভালো করে লক্ষ্য করো। ও ‘হেলমেট পাওয়ার রেঞ্জার’এর ফিগারিনের দিকে দেখাচ্ছে’।

‘হেলমেট পাওয়ার রেঞ্জার! হেলমেটের জ্বালায় যাদের মুখ দেখারই জো নেই...!’

অধিরাজ মৃদু হাসে—‘ঠিক তাই। সম্ভবত ও বলতে চাইছে, কাল যে লোকটা এসেছিল তার মুখ হেলমেটে ঢাকা ছিল। কিলার হেলমেট পরে এসেছিল’।

অর্নব এতক্ষণে বুঝল। সে সপ্রশংস দৃষ্টিতে স্যারের দিকে তাকায়।

‘আর কিছু মনে আছে বাবা তোমার?’ অধিরাজ আবার নরম সুরে জানতে চায়—‘লোকটা কী করেছিল? তোমাকে পিৎজা দিয়েছিল?’

প্রিয়ম্ ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ -- হ্যাঁ।

‘তারপর?’

প্রিয়ম্ কী বলবে বুঝে পাচ্ছেনা। অধিরাজ নরম ও সস্নেহ কণ্ঠে জানতে চায়—‘ আচ্ছা, বলো তো, লোকটা কি সবসময়ই হেলমেট পরেছিল?

শিশুটি মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল—না!

boierpathshala.blogspot.com

‘তার মানে আঙ্কেলটা হেলমেট খুলেছিল?’

প্রিয়ম্ ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে।

অধিরাজ উত্তেজিত—‘তুমি তার মুখ দেখতে পেয়েছিলে?’

বাচ্চাটা নেতিবাচক ভাবে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, না দেখতে পায়নি। সে একটু হতাশ হল। কিন্তু তবু জিজ্ঞাসা করল--

তারপর আর কী করল?’

শিশুটি একমনে কিছুক্ষণ ভাবে। কিছু যেন বলতে চাইছে, অথচ প্রকাশ করতে পারছে না। ঠোঁটদুটো বার দুয়েক খুলল। যেন কিছু বলতে চায়। কিন্তু বুঝতে পারছে না কীভাবে বোঝাবে।

‘হ্যাঁ। বলো। কী দেখেছিলে বাবু?’

প্রিয়ম্ আঙুল তুলে কিছুর দিকে নির্দেশ করে। অধিরাজ ও অর্নব বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল সে দাঁড়ে বসে থাকা সাদা কাকাতুয়াটার দিকে তর্জনী তুলে দেখাচ্ছে! কাকাতুয়াটা যেন ঘাবড়ে গিয়ে ডানা ঝাপ্টে চিৎকার করে উঠল—‘আমি না! আমি না! আমি না!’

স্তম্ভিত হয়ে কিছুক্ষণ সেদিকেই তাকিয়ে থেকে বিহ্বল স্বরে বলল অধিরাজ—‘কাকাতুয়া! মানে?’

৩.

‘তোমার সন্দেহই সঠিক রাজা’। ডঃ চ্যাটার্জী এতক্ষণ ল্যুমিনল টেস্ট করে দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাতের গ্লাভ্স খুলছেন তিনি—‘মেঝের রক্ত মুছে দেওয়া হয়েছে। লাশের আশেপাশের অনেকটা জায়গা জুড়েই ল্যুমিনল নীল ছোপ ছেড়েছে। ওই পুরো জায়গাটাই সম্ভবত রক্তে ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু খুনী মুছে দিয়েছে’।

বলতে বলতেই তিনি একটা ডান্ডা তুলে ধরলেন। ডান্ডাটার নীচে কাপড় লাগানো। দেখতে অনেকটা ঝাঁটার মতন।

‘এই মপ্ দিয়েই ঘষে ঘষে মেঝে পরিষ্কার করেছে কিলার। প্রাথমিক ভাবে এটাতে রক্তের ট্রেস পেয়েছি। কিন্তু ডিটেলড্ এক্সামিনেশনের আগে এর বেশি কিছু বলতে পারছি না’।

অধিরাজ ঝাঁটা—অর্থাৎ মপ্টার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে! এমন আশ্চর্য নিপাট সাফসুতরো, টিপ-টপ এবং দয়ালু খুনী সে বাপের জন্মে দেখেনি। বাবাকে খুন করে বাচ্চাটাকে পিৎজা উপহার দেয়! কোথায় খুন করে তড়িঘড়ি পালাবে, তা নয়—রক্তের দাগও বসে বসে ধীরে সুস্থে পরিষ্কার করেছে! তার হাতে বড়জোর সাত থেকে আট মিনিট ছিল। এত তাড়াতাড়ি রক্তের দাগ পরিষ্কার করে সে পালিয়ে গেল কী করে? সত্যিই কি অর্নবের কথামত ফায়ার এক্সিটের লোহার সিঁড়ি বেয়ে পালিয়েছে? না আদৌ পালায়ইনি! লোকটা এই টাওয়ারের বাসিন্দা নয়তো? যদি তাই হয় তবে মোটিভ কী? মোডাস অপারেন্ডি কী? সবই যে গুলিয়ে যাচ্ছে!

‘আপাতত আমি বডি আর এভিডেন্স সমেত ল্যাবে চললাম’। তিনি বললেন—‘ওখানেই তোমার সঙ্গে মোলাকাত হচ্ছে তবে’।

‘ওকে ডক্’।

boierpathshala.blogspot.com

অর্নব এতক্ষণ বাইরের অতি উৎসাহী লোকের ভিড় সামলাচ্ছিল। টুকটাক করে জেনেও নিচ্ছিল কাল রাতে কোনও অচেনা লোককে কেউ এই টাওয়ারে ঢুকতে দেখেছে কিনা। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। সিকিউরিটিও তেমন কিছু খোঁজ দিতে পারল না। তবে এইটুকু জানা গেল যে কাল রাতে কোনও পিৎজা ডেলিভারি বয় এদিকে আসেনি। তেমন কেউ এলে সিকিউরিটির রেজিস্টারে অবশ্যই এন্ট্রি থাকত। অনেক জেরা করার পরেও প্রয়োজনীয় তথ্য না পেয়ে সে ব্যর্থ সিপাইয়ের ভঙ্গিতে অধিরাজকে রিপোর্ট করল।

'আমার ইনট্যুইশন বলছে, কেসটা হয়তো অত সহজ নয়। এটা আবার একটা প্যারাডক্স অর্নব!...আবার একটা মস্ত বড় প্যারাডক্স!' সে বিড়বিড় করে—'তবু প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেলই খতিয়ে দেখতে হবে। খবরিদের নেটওয়ার্ক অ্যাক্টিভেট করো। দেখো, কোথাও কোনও হিস্ট্রিশিটার সুপারি পেয়েছে কি না! আরও একটা বিষয়...!'

'ইয়েস স্যার...?'

'খোঁজ নাও এর আগে অবিকল এমনই ঘটনা কোথাও ঘটেছে কিনা'। অধিরাজ যেন ঘোরের মধ্যে কথা বলছে। তার চোখদুটো আচ্ছন্ন—'আমার মন বলছে, কেসটা ঐ অ্যাঙ্গেলে খোলার সম্ভাবনা আছে। তন্ন তন্ন করে এরকমই একটা বা একাধিক খুনের রেকর্ড খোঁজো! পেয়ে গেলে আশ্চর্য হব না'।

অর্নব বুঝতে পারল স্যার কোন্ অ্যাঙ্গেলের কথা বলছেন। সে বিস্মিত হয়ে বলে—'সাইকো কিলার?'

'হতে পারে'। অধিরাজ সিগারেটে একটা লম্বা টান দেয়—'অন্তত অসম্ভব নয়! ঐ গ্রাফিটিটা সন্দেহজনক। খুব সন্দেহজনক। কিলার প্রিয়ম্‌কে ছেড়ে দিল কেন? খুনটা ডাকাতি বা টাকাপয়সার জন্য হয়নি! রিভেঞ্জের জন্য হয়েছে? তবে খুনী আচমকা রক্ত দিয়ে দেওয়ালে লিখল কেন 'হেট ইউ বাবা'? কাজের পেছনে কোনও কারণ থাকলে বুঝি। কিন্তু এখানে কোনও কারণই নেই! এই অযৌক্তিক কাজগুলোই সন্দেহ জাগাচ্ছে অর্নব! সচরাচর এরকম অযৌক্তিক কাজ সাইকো কিলাররাই করে। স্ট্রেঞ্জ! এক্সট্রিমলি স্ট্রেঞ্জ!'

অর্নব চুপ করে থাকে। সত্যিই, ঘটনাটা এখন বড্ড প্যাঁচালো মনে হচ্ছে তার। খুব সহজ খুনের কেস নয় এটা। অনেক ঘোর-প্যাঁচ আছে।

'স্নিফার ডগ কখন আসবে?'

'এই তো স্যার'। অর্নব জানায়—'বড়জোর মিনিট দশেক'।

'ঠিক আছে'। সে মৃদু স্বরে বলল—'এক কাজ করো। এতক্ষণ যেভাবে জেরা করছিলে তেমনই আরেকচোট জেরা করে নাও। যে ক'টা সিসিটিভি চলছে সেগুলোর ফুটেজ জোগাড় করো। তবে এবার পিৎজাবয়ের কথা জিজ্ঞাসা করবে না। বরং এই সোসাইটিতে কার কার বাইক বা স্কুটার আছে, কিংবা গত সাতদিনে ক'টা বাইক বা স্কুটার এ চত্বরে ঢুকেছে সে খবরটাও নাও'।

'বাইক!'

'অবশ্যই'। অধিরাজ সপ্রতিভ—'চারটে ক্লু অলরেডি পেয়েছি। তার মধ্যে প্রথমটা হল ভোজালিটা। ওয়েপ্‌ন্ অফ মার্ডার। দ্বিতীয়ত খুনী পিৎজা নিয়ে এসেছিল। এক্ষেত্রে পিৎজার বক্সটা এভিডেন্স। থার্ড ক্লু হল খুনীর হেলমেট। যে লোক হেলমেট পরে সে এমনি এমনি হেলমেট নিশ্চয়ই পরে না। ইন দ্যাট কেস বুঝতে হবে যে হেলমেট পরার জন্য তার নির্ঘাৎ একটা টু-হুইলার—মানে বাইক বা স্কুটার আছে'।

এতক্ষণে বুঝল অর্নব। মনে মনে স্যারের তারিফ করতে করতে জিজ্ঞাসা করল—'আর ফোর্থ ক্লু?'

অধিরাজ তার শিশুসুলভ দুষ্টু হাসিটা হেসে বলে—'পরে বলব। তাড়া কিসের? যতক্ষণ না স্নিফার ডগ আসছে, তুমি বরং আমাকে বাইক সংবাদটা এনে দাও'।

boierpathshala.blogspot.com

‘ওকে স্যার’।

অর্নব ফের ফিরে গেল জমায়েতের কাছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। নিজেদের ফ্ল্যাটেই ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে এরকম একটা নৃশংস হত্যাকান্ড হয়ে যাওয়ায় অধিবাসীদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা ও চাঞ্চল্য! হাউজিঙের সেক্রেটারি পরাশর চৌধুরী এমনিতে বয়স্ক পুরুষ। তবে ভারি সুদর্শন! তার চুলের কেয়ারিটিকে রীতিমত বিশ্বের অষ্টমাশ্চর্যের খেতাব দেওয়া যায়! নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে খুব সচেতনও। কিন্তু অবস্থাগতিকে বেচারি পুরো কাঁচুমাচু মুখ করে হাতজোড় করেই আছেন। যেন খুনটা তিনিই করেছেন। সবাই মিলে তাকে শাপশাপান্ত করছে। এ হাউজিঙে সিকিউরিটির রাশ ঢিলে, সিকিউরিটি কাজ করে না—স্রেফ ঘুমোয়, সিসিটিভির বন্দোবস্ত নেই, কোনওরকম নিরাপত্তা নেই, এমন অনেক অভিযোগের তীর ছুটে আসছে তাকেই লক্ষ্য করে। অভিযোগকারীদেরও দোষ নেই। প্রায় নাকের সামনেই এরকম একটা খুন হয়ে যাওয়ায় প্রত্যেকেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। কিন্তু মজার কথা হল এর মধ্যেও ভদ্রলোক নার্ভাস হয়ে যত না ঘন ঘন ঘাম মুছছেন তার থেকেও বেশি ঘন ঘন চিরুনি দিয়ে চুল ঠিক করছেন! একজন রীতিমত ক্ষুব্ধ স্বরে বলল—

‘ঐ করুন সারাদিন বসে! চিরুনি দিয়ে নিজের চুলের কেয়ারিটাই ঠিক করুন! এরপর যখন খুনী এসে ঐ কেয়ারিশুদ্ধ মুন্ডুটাই ফাঁক করে দেবে, তখন বুঝবেন ঠ্যালা!’

ভিড়টা হৈ হৈ করে উঠল। পরাশরবাবু প্রতিবাদে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন! কিন্তু অর্নব সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চুপ করে গেলেন। তবে তার মুখের অসন্তোষের রেখাগুলো মুছল না।

‘আপনাদের সোসাইটিতে কার কার বাইক বা স্কুটার আছে?’

অর্নবের এমন আচমকা প্রশ্নে ভিড়টা যেন একটু বিস্মিত হয়। পরাশর চৌধুরী আমতা আমতা করে জানালেন—‘বাইক! মানে হঠাৎ বাইকের কথা...?’

‘তদন্তে প্রয়োজন’। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে সে আবার প্রশ্নটা করল—‘এখানে কার কার বাইক বা স্কুটার আছে?’

‘আমার বাড়িতে আছে’। পরাশরবাবু মৃদু স্বরে জানালেন—‘অবশ্য আমি চালাই না। অফিসে যাতায়াতের জন্য ফোর হুইলারটাই ইউজ করি। বাইকটা আমার ছেলের ’।

প্রিয়ম্‌দের ঠিক নীচের তলার ফ্ল্যাটের প্রতিবেশী বিপুল রায় স্তিমিত স্বরে বললেন—‘আমারও বাইক আছে। ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে বাইকটাই অনেক বেশি সুবিধাজনক। আমি নিজেই চালাই’।

পরাশরবাবু একটু থেমে ফের মুখ খোলেন—‘ফার্স্ট ফ্লোরের অমিত মুখার্জীরও বাইক এবং স্কুটি দুটোই আছে। বাইকটা উনিই চালান। স্কুটিটা ওঁর স্ত্রী’র। এছাড়া আমাদের সিকিউরিটি সিদ্ধেশ্বরের বাইক আছে। লেফ্‌ট উইং এর পশুপতিবাবু, কপিল মিশ্র আর ডঃ তেজেন বর্মনের ছেলের বাইক আছে। এছাড়া বাকিরা সবাই হয় ফোর হুইলার ইউজ করেন। নয়তো কাছ থেকেই বাস বা মেট্রো ধরে নেন’।

অর্নব চুপচাপ সবটাই নোট করে নিল। আপাতত ডেটা কালেকশনের জন্য নামগুলো দরকার। পরে স্যার এই লিস্ট ধরে ধরে জেরা করবেন।

‘আপনাদের হাউজিঙে সিসিটিভি অ্যালট করার কথা বলা হয়েছিল না?’ সে লিস্টে নাম লিখতে লিখতেই প্রশ্নটা আলগোছে ছুঁড়ে দেয়।

পরাশরবাবু কাঁচুমাচু মুখে উত্তর দেন—‘হয়েছিল। কিন্তু এই উইং এর সব ফ্ল্যাটে করা হয়ে ওঠেনি। দু চারটে ফ্ল্যাটে অবশ্য সিসিটিভি আছে। ফার্স্ট ফ্লোরে, থার্ড ফ্লোরে, ফিফ্‌থ ফ্লোরের কিছু কিছু ফ্ল্যাটে সিসিটিভি লাগানো হয়েছিল। কিন্তু বাকিগুলো এখনও হয়ে ওঠেনি। চেষ্টা করছি আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সব ফ্ল্যাটে সিসিটিভি

boierpathshala.blogspot.com

অ্যালট করানোর'।

'হ্যাঁ, ততদিনে আরও কয়েকটা খুন হয়ে যাক্'। বিপুল বাবু অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলেন—'তোমার আর কী? নিজের ঘরে তো দিব্যি সিসিটিভি লাগিয়েছ। রিস্ক তো আমাদের!'

ভিড়টা ফের হাঁউমাউ করে উঠল। সম্ভবত এদের কারোর ঘরেই সিসিটিভি নেই। চমৎকার একটা 'নারদ-নারদ' পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে পারস্পরিক দোষারোপ এবং খন্ডযুদ্ধের মধ্যে গেল না অর্নব। বরং হাত তুলে সবাইকে নিরস্ত করে বলল—'গেটে সিসিটিভি আছে?'

'আছে'।

'তবে গেটের সিসিটিভি আর যে ক'টা ফ্ল্যাটে সিসিটিভি আছে তার ফুটেজ আমাদের দিতে হবে'।

'কিন্তু স্যার, ফ্ল্যাটের ভেতরের সিসিটিভি ফুটেজ! ফ্ল্যাটের লোকেরা কি অ্যালাউ করবেন?' তিনি ইতস্ততঃ করছেন—'প্রাইভেসির দিকটাও তো দেখতে হবে'।

'এখন ওসব ভাবলে চলবে না'। সে একটু কম্যান্ডিং টোনে বলে—'একটা খুন হয়ে গিয়েছে। আমরা আর রিস্ক নিতে চাই না। সবাই একটু কো-অপারেট করুন। এটা আপনাদেরই সুরক্ষার ব্যাপার'।

পরাশরবাবু বাধ্য ছেলের মত ঘাড় নাড়লেন। উপায় ছিল না। আপনি বাঁচলে তবে প্রাইভেসির নাম। অস্ফুট স্বরে জানালেন—'ওকে স্যার। পেয়ে যাবেন'।

অর্নব এবার চোখ তুলে সিকিউরিটি গার্ড সিদ্ধেশ্বরের দিকে তাকায়। তার মনে হল, লোকটা যেন একটু ভয় পেয়েছে। একেই তার ডিউটি আওয়ারের মধ্যে এরকম ভয়ঙ্কর একটা খুন হল, তার ওপর বাইকের ব্যাপারটা ওকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছে। অর্নবের ওর মুখ দেখে মনে হল, আগামী কয়েকমাসে ও আর যাই করুক, বাইকে ভুলেও উঠবে না!

'সিদ্ধেশ্বর'।

'হ্যাঁ?' একটু কাঁপা গলায় উত্তর দেয় সে।

'গত সাতদিনের সমস্ত এন্ট্রি ঠিকমত রেজিস্টার্ড আছে?'

'আছে স্যার'।

'তবে গত সাতদিনের সমস্ত রেকর্ড আমাদের চাই। কে কখন এসেছিল, কিসে চেপে এসেছিল, ফোর-হুইলারে হলে তার নম্বর, কিংবা বাইকে এলে বাইকের নম্বর, সোসাইটির লোক ছাড়া নতুন কেউ, অচেনা কেউ এসেছিল কিনা, কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল—সব ইনফর্মেশন দরকার পড়বে। রেজিস্টার খাতাটা এনে দিন'।

সিদ্ধেশ্বর মাথা নেড়ে চলে গেল। তার চলে যাওয়া দেখে মনে হল—এক্ষুনিই হয়তো তাকে আজীবন দ্বীপান্তর বা ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়েছে। ভিড়ের মধ্য থেকে আলটপকা মন্তব্য ভেসে আসে—'সিদ্ধেশ্বরই বটে। গাঁজায় সিদ্ধিলাভ করেছে। কাল রীতিমত নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। ওকে ডেকে তুলতে প্রাণ গেছে আমাদের'।

কন্ঠস্বরটা ভারি চমৎকার। বক্তাকে দেখবার জন্য ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় অর্নব। এক ফর্সা চেহারার তরুণ কথাটা ছুঁড়ে দিয়েছে। বেশ লম্বা অ্যাথলেটিক চেহারা। থুতনিতে একটা কাটা দাগ।

'আপনি?'

boierpathshala.blogspot.com

তরুণটি মৃদু হাসল—'আমি অমিত। অমিত মুখার্জী। ফার্স্ট ফ্লোরে থাকি'।

অর্নবের মনে পড়ল এর কথাই বলছিলেন পরাশরবাবু। এই ভদ্রলোকের বাইক আর স্কুটার—দুটোই আছে। সে কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল—'কাল খুনের ব্যাপারটা কি আপনিই প্রথম টের পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ'। অমিত কিন্তু বাকিদের মতন একটুও নার্ভাস হননি। বরং স্মার্টলি উত্তর দিলেন—'হ্যাঁ, আমি আর কপিলই প্রথম টের পাই'।

কপিল নামটাও পরিচিত। কপিল মিশ্র! তারও বাইক আছে। অর্নব কোনও কথা না বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়। ভাবটা এমন যেন জানতে চাইছে—'তারপর?'

'রোজ খাওয়াদাওয়ার পর আমি আর কপিল একটু সোসাইটির গার্ডেনে হাঁটাহাঁটি করি। কালও তাই করছিলাম...'। অমিত বলেই চললেন। কিছু মানুষ আছে যারা একবার কথা বলতে শুরু করলে থামবে কিনা গ্যারান্টি নেই। কিছু বলতে বলা হলে তো বলবেই, না বলতে বললে আরও বেশি বলবে। অমিত মুখার্জী সেই জাতেরই লোক। অর্নব বাধা দিল না। অনেক সময় এদের কথায় কিছু সারবস্তু থেকে যায়।

'ঠিক বারোটা নাগাদ আমাদের কানে চিৎকার আসে। আমরা প্রথমে বিরক্তই হয়েছিলাম। এমনিতে ও ফ্ল্যাট থেকে অষ্টপ্রহর চিলচিৎকারই ভেসে আসে। কিন্তু কাল একদম এক্সট্রিম! ভাবলাম রাক্ষসটা বোধহয় প্রিয়ম্‌কে মেরেই ফেলল! তারপর সিধুকে কোনমতে ডেকে তুলে উপরের দিকে আসি। আমরা ছাড়া আরও অনেকেই আওয়াজ পেয়েছিলেন। চিৎকারটা এত জোরে হয়েছিল যে লেফ্‌ট উইং এর অনেক লোকেরই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু আমরা আসতে আসতেই সব শেষ'।

অর্নব বিপুলবাবুর দিকে তাকায়—'আপনি তো প্রিয়ম্‌দের ফ্ল্যাটের একদম নীচের ফ্ল্যাটটায় থাকেন। আপনি কিছু শোনেননি?'

বিপুলবাবু অপ্রতিভভাবে কিছু বলতেই যাচ্ছিলেন। তার আগেই তাকে থামিয়ে দিয়েছেন অমিত—'শোনেননি আবার! খুব শুনেছিলেন! কিন্তু ওপরে ওঠার বদলে উনি দরজায় ডাব্‌ল তালা দিয়ে বসেছিলেন। আমরা ওঁর ঘরের দরজা ধাক্কাধাক্কি করেও সাড়া পাইনি। ভয়ে একেবারে ঘাপ্টি মেরে বসেছিলেন। আমরা প্রায় ভাবতেই বসেছিলাম যে উনিও গেলেন বুঝি! ভাগ্যিস্ দরজা ভাঙার আগেই প্রভু বেরিয়ে এসেছিলেন, নয়তো ওঁর দরজাটা যেত!'

অমিতের কথায় একধরণের নির্লজ্জ শ্লেষ ছিল। অর্নব কিছু বলার আগেই বিপুল খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠেন—'নয়তো কী করতাম? অত বীরত্বে আমার কাজ নেই বাপু! শেষমেষ ভোজালিওয়ালা খুনীটা আমার ওপরই চড়াও হত আর কী! তোমাদের মত অত সাহস নেই আমার। ছাপোষা লোক! খুনী-ডাকাতের সঙ্গে পাঙ্গা নিয়ে মরব নাকি?'

অর্নব দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওদের দোষ নেই। এটাই ফ্ল্যাট কালচার। টিপিক্যাল 'নিজের মশা নিজে মারুন' মনোভাব। উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে যদি বোমও পড়ে, তবু দরজা খুলবে না। সাহায্য করতে এগিয়ে যাবে না। অথচ এই লোকটা যদি একটু সাহস করে উপরতলার দিকে ছুটে যেত তবে হয়তো খুনী ধরা পড়ে যেত। আর যাই হোক্, এত আরামসে কাম তামাম করে চলে যেতে পারত না।

প্রাথমিক ভাবে সব কিছু শেষ করে সে যখন স্যারকে রিপোর্ট করল, ততক্ষণে অধিরাজ হাফ প্যাকেট সিগারেট ধোঁয়া করে ফেলেছে। অর্নব কোনও কথাই বাদ দিল না। এমনকি বিপুল-অমিত তরজাও বিস্তারিত বলল। অধিরাজ কোনও মন্তব্য না করে শুধু আলগোছে একটা 'হুঁ' বলে চুপ করে যায়। তার চোখ তখনও অন্যমনস্ক। কপালে মস্ত বড় ভাঁজ। সে এখনও এই খুনের সঠিক দিশার খোঁজ পায়নি। একের পর এক ঢিল ছুঁড়ছে ঠিকই।

boierpathshala.blogspot.com

কিন্তু সবটাই অন্ধকারে। আদৌ লাগবে কি না জানে না।

অর্নবের ফোন ইতিমধ্যেই আওয়াজ করে ওঠে। ওপ্রান্ত থেকে বার্তা এল—স্নিফার ডগ এসে গিয়েছে।

'এসে গিয়েছে?' অধিরাজ যেন সম্বিত ফিরে পায়। উঠে দাঁড়িয়ে বলে—'বেশ। আমি দেখছি। তুমি ততক্ষণে প্রিয়ম্‌দের ফ্ল্যাটের কাকাতুয়াটাকে দাঁড় শুদ্ধ নামিয়ে নিয়ে এসো'।

'কাকাতুয়া স্যার!'

'অবশ্যই'। সে অন্যমনস্ক স্বরে বলল—'প্রিয়ম্ ঐ কাকাতুয়াটার দিকে দেখিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল। যতক্ষণ না কাকাতুয়ার রহস্য বুঝতে পারছি, ততক্ষণ কাকাতুয়াটাকে হেফাজতে রাখা ভালো। তুমি ফোর্থ ক্লু এর কথা বলছিলে না? কাকাতুয়াটাই আমার ফোর্থ ক্লু। নিয়ে এসো ওটাকে'।

অর্নব ইতিবাচক ভঙ্গি করে প্রিয়ম্‌দের ফ্ল্যাটের দিকে চলে যায়।

অপরাধীর ডায়েরি

আমার ভারি মজা লাগছিল।

চিরকালই জানি আমার মাথায় বুদ্ধি আছে। কলেজে, হোস্টেলে বদবুদ্ধির প্রদর্শন অনেকবার করেছি। কিন্তু এবারের প্যাঁচটা একদম মোক্ষম। অন্তত হেলমেট পরে যাওয়ার বুদ্ধিটা যে মাঠে মারা যায়নি, তা সি আই ডি অফিসারের কান্ড দেখেই বুঝলাম। উনি হেলমেটের কথা শুনেই বাইকের পেছনে পড়লেন। জানতাম, পুলিশের যে কোনও অফিসারই তাই পড়বেন। বেচারা! ওদের দোষ কী? ওরা কিভাবে জানবেন যে আমি জীবনেও বাইক চালাইনি। আমার কস্মিনকালেও বাইক ছিল না! এখনও নেই!

হ্যাঁ। আমিই প্রিয়মের বাবাকে খুন করেছি। বেশ করেছি। ও লোকটার বেঁচে থাকার কোনও অধিকার ছিল না! এক নম্বরের অমানুষ! কতগুলো জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে থেকে থেকে ওর স্বভাবটাও জানোয়ারের মত হয়ে গিয়েছিল। শুনেছি বেশিরভাগ জন্তুরাই নাকি নিজের সন্তানকে খেয়ে ফেলে। জন্তুদের দোষ দিই না। এইজন্যই ওদের নাম মানুষ নয়। কিন্তু প্রিয়মের বাবাকে কী বলব? লোকটাকে দেখলেই আমার হাড় জ্বলে যেত! একদম সেই রকম! অবিকল একরকম! অবিকল সেই লোকটার মত! এই শালাদের কোনও জাত হয় না! এরা আর কারোর ধার ধারে না। স্ত্রী-সন্তানদের হাড় ভাজা ভাজা করে খায়। আমার মনে হয় না ওর মৃত্যুতে রুমা খুব দুঃখ পাবে। অথবা প্রিয়ম্ ভেঙে পড়বে। আপাতত শোকের অ্যাকটিং করছে বটে, কিন্তু আমি জানি—ওরা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে!

প্রিয়ম্ ছেলেটা ভারি সুন্দর। কথা বলতে পারে না ঠিকই। কিন্তু একটা অপারেশন করালেই ও কথা বলবে। রুমার সঙ্গে সরাসরি কখনও কথা হয়নি। কিন্তু ওকে সোসাইটির দু একজনের কাছে আফসোস করতে শুনেছি। এই হারামী লোকটা মদ, বেশ্যা, ঘোড়দৌড়ের পেছনে সব টাকা ওড়াচ্ছিল। নিজের রোজগার ছিল না কিছু। হোটেলটাও বন্ধক দিয়েছে। রুমার পয়সায় বাবুগিরি করা হচ্ছিল। আমি বেশি কিছু করিনি। প্রিয়মের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করেছি। শুয়োরের বাচ্চাটার অত্যাচার থামিয়েছি। সেদিক দিয়ে কি আমাকে সমাজ সংস্কারক উপকারী প্রাণী বলা যায় না?

লোকে বলবে আমি খুনী। হতে পারি। কিন্তু এই লোকগুলো কি খুনী নয়? ক্রমাগত নিজেরই পরিবারের ওপর অত্যাচার করে চলেছে! প্রিয়ম্ কিংবা রুমার সঙ্গে ও যেটা করত—সেটা মেন্টাল, ফিজিক্যাল টর্চার নয়? অন্যায় নয়? হয়তো এভাবেই অত্যাচারিত হতে হতে কোনওদিন রুমা ভাবতে বসত কোন্ পথটা নেবে! বিষ—কেরোসিন

boierpathshala.blogspot.com

দেশলাই না কলসী দড়ি? হয়তো এতদিনে কিছু করেও বসত। স্রেফ প্রিয়মের জন্য...—

“Rose a nurse of ninety years,

Set his child upon her knee—

Like summer tempest came her tears—

‘Sweet my child, I live for thee.”

টেনিসন কবিতাটা নেহাত হাওয়ায় লেখেননি। আমার মাও তো এভাবেই বাঁচত। সব অসহায়, নিরূপায় মা’ই এমন করে বাঁচে। রুমা যদি অন্যকিছু করে বসত সমাজের চোখে সেটা আত্মহত্যা হত। কিন্তু আমি জানি—আমি বুঝেছি, এ ও একজাতীয় মার্ডার! তিলতিল করে একটা লোকের অন্তরাত্মা মরছে। একটু একটু করে শেষ হচ্ছে তার জীবনীশক্তি! আর কেউ না জানুক, আমি জানি। আমি জানি রোজ এইভাবে একটু একটু করে মরতে কেমন লাগে! নিজের অতীতকে ভুলে যাওয়া অত সহজ নয়। প্রিয়ম্ আমায় আয়না দেখিয়ে দিয়েছিল। ওর মধ্যে বারবার নিজেকেই দেখেছি। ওর চোখদুটো বড় অসহায় ছিল। বুঝেছিলাম ও বিপন্ন। সেই লোকটার মত ওর বাবাও ওকে খুন করে ছাড়বে...! মৃত্যুর আগে শেষ চেষ্টার মত ও যেন বলে চলেছে—‘প্লিজ্ সেভ মি...!’

আমিও একসময়ে বলেছিলাম। কেউ শোনেনি। রোজ সেই লোকটা মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরত। আমার ভয় করত। ভীষণ ভয়। কারণ পরের দৃশ্যটা জানা ছিল! লোকটা খেতে বসেই চিৎকার শুরু করবে! মায়ের চুল ধরে ঠাস্‌ঠাস্ করে চড় কষাবে। বলবে—

‘এটা ডাল হয়েছে! আমার শ্রাদ্ধের পিন্ডি হয়েছে! ভাতটা গরম করিস্‌নি কেন? দলা দলা হয়ে আছে! শালি, সারাদিন বাড়িতে বসে করিস কী তুই? একটা কাজও ঠিকমত করিস্ না! পটের বিবি! অ্যাঁ?’

মা প্রায় লোকটার পায়ে পড়ে কাকুতিমিনতি করত। কিন্তু লোকটা থামত না। বলত—‘তবে রে হারামজাদি! মুখে মুখে তর্ক করিস! আজ তোর একদিন কী আমার একদিন...!’

বলতে বলতেই কোমরের চামড়ার বেল্ট বের করে আনত। তারপর সেই বেল্ট দিয়ে প্রথমে মাকে, তারপর আমাকে...!

তখন আমাদের বাঁচাতে কেউ আসেনি। আমাকে আর মাকে ফ্ল্যাটেই তালাবন্দী করে রেখে চলে যেত লোকটা। সারারাতের অত্যাচারের দাগ গায়ে নিয়ে আমি আর মা সারাদিন মরতে মরতে কাটাতাম। রাত্রে আবার মার খাওয়ার টার্ন কখন আসবে সেই আশঙ্কায় কাঁপতে কাঁপতে অসহ্য ভয়ে প্রতিটা প্রহর গুনেছি আমরা! কখনও কখনও বাঁচার চেষ্টাও করেছি। সাদা কাগজ ছিঁড়ে চিট তৈরি করে লিখতাম ‘প্লিজ সেভ আস্’। তারপর নীচে ফেলে দিতাম। কেউ যদি পেয়ে যায়...কেউ যদি আমাদের বাঁচাতে আসে...কেউ যদি মুক্তি দেয়...এই আশায়...!

কিন্তু বহুতলের বারান্দা থেকে ফেলা চিটগুলো কখনও কোনও মানুষের হাতে পড়লই না! হতাশ চোখে দেখতাম কাগজের টুকরোগুলো হাওয়ায় উড়তে উড়তে গাড়ির তলায় চলে গেল। অথবা পড়ে গেল নর্দমায়! সোসাইটির ঝাড়ুদার ঝাঁট দিয়ে সেই অমূল্য কাগজগুলো ফেলে দিত ডাস্টবিনে...! অথচ ঐ একটুকরো কাগজের ওপর নির্ভর করছিল আমাদের বাঁচা-মরা!...ঐ ক’টা শব্দ—‘প্লিজ্ সেভ আস্...!’...কেউ দেখল না! কেউ দেখল না...!

এখন তাই আর কাউকে কিছু বলি না। যা বলার ডায়েরিটাকেই বলি। সাদা পাতাগুলো ভরে ওঠে। তারপর কাগজগুলো ধরে পুড়িয়ে দিই। এ জগতে আমার কথা শোনার, বোঝার কেউ নেই...! কেউ ছিল না!

কিন্তু প্রিয়ম্‌দের জন্য আমি আছি। আই উইল সেভ দেম্! এটাই আমার রিভেঞ্জ! প্রথমটাকে মেরেছি। এবার

boierpathshala.blogspot.com

নেক্সট টার্গেট...!

আই হেট ইউ বাবা!...আই স্টিল হেট ইউ...!

#পিৎজা (দ্বিতীয় কিস্তি)

৪.

'এই টাকলু...চুপ কর্...!'

পেল্লায় ধমক খেয়ে মুখ কাঁচুমাচু হয়ে যায় ডঃ চ্যাটার্জীর। বেচারির দোষ নেই। তার নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট আহেলি কাজে একটু গড়বড় করে ফেলেছিল। তিনি স্বভাবগত বিরক্তিতেই মেয়েটিকে বকা ঝকা করছিলেন। কিন্তু বকবেন কী! দুটো কথা বলার পরই তার থেকেও তিরিক্ষি গলায় ধমক ভেসে এল—'এই টাকলু! চুপ কর্ বলছি'।

এবার আর সহ্য হল না ডঃ চ্যাটার্জীর! সকাল থেকেই এই অনভিপ্রেত বসিং-এর চোটে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত! যাকেই একটু উঁচু স্বরে বকতে যান, এ ব্যাটা ঠিক মাঝখানে পড়ে কড়কে দেয়! এখন তো তার ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টরাও আড়ালে হাসাহাসি করতে শুরু করেছে। স্যারকে মুখের ওপর 'টাকলু' বলতে এতদিন আর কাউকে দেখেনি তারা। কিন্তু এখন ভদ্রলোকের প্রেস্টিজে পুরো গ্যামাক্সিন!

'যেমন মালিক, তার তেমন পুষ্যি...!' হাতে বিকার নিয়েই তেড়ে গেলেন ডঃ চ্যাটার্জী—'হতভাগা! তোর ছাল ছাড়িয়ে, নুন মাখিয়ে যদি রোস্ট করে না খেয়েছি...!'

'অমন সুন্দর কাকাতুয়াটাকে দেখে আপনার রোস্ট করে খেতে ইচ্ছে করল!' পেছন থেকে অধিরাজের কন্ঠস্বর ভেসে এল—'মেনে নিলাম ডক্। আপনি সত্যিই 'ঝিঙ্গা লালা হু'। একেবারে খোদ আমাজনের আম আমদানি'।

ডঃ চ্যাটার্জী গর্‌গর্ করে ওঠেন—'না খাব না! ওকে ধুপ ধুনো দিয়ে পুজো করব! সকাল থেকে টাকলু টাকলু করে কানের মাথা খেয়ে নিচ্ছে! গত দুদিন ধরে কাউকে কিছু বলার উপায় নেই। কিছু বললেই তারস্বরে ধমক!' ভদ্রলোকের মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে গিয়েছে—'একেবারে সবার সামনে ভজুয়া বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে হে। এত ধমক ছোটবেলায় বাবার কাছেও খাইনি! এ কি সহ্য হয়!'

অধিরাজের ঠোঁটে দুষ্টু হাসি—'তাজমহল তবে আজ গম্বুজ হইয়াছে...'। বলতে বলতেই তার গম্বুজের মত টাকটিকে অপাঙ্গে দেখে নিল—'যাক্, কাকাতুয়াকে ছাড়ুন। কোনও নতুন খবর আছে?'

'নতুন খবর একটাই'। ডঃ চ্যাটার্জী বললেন—'ঝিঙ্গা লালা হু-উ-উ'।

'মানে?'

'তুমিই তো বললে আমি আমাজনের আমদানি'। তিনি নিস্পৃহ মুখে জানান—'অতএব নিজেই আমাজনের ভাষা বুঝে নাও'।

'ওঃ ডক্...'। অধিরাজ আর কিছু বলার আগেই কাকাতুয়াটা কড়কড় করে বলে ওঠে—'চুপ কর টাকলু...মিথ্যে বলিস্‌নি'।

'তবে রে ব্যাটা...!' একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় বাগিয়ে তেড়ে গেলেন ডঃ চ্যাটার্জী—'ফের ফাজলামি। এক

boierpathshala.blogspot.com

থাপ্পড়ে তোর বত্রিশটা দাঁত না ফেলেছি...!'

'ক্রক্'। কাকাতুয়াটা যেন ভেঙচি কাটল—' মারব থাপ্পড়!'

'হ-ত-ভা-গা...কাকাতুয়ার বাচ্চা!'

ডঃ চ্যাটার্জী সত্যি সত্যিই চড় বসিয়ে দিতেই যাচ্ছিলেন। তার আগেই তাকে চেপে ধরেছে অধিরাজ—'আরে! করেন কী!'

'ছেড়ে দাও রাজা!' তিনি প্রায় ধস্তাধস্তি করছেন—'আমায় টাকলু বলা! ব্যাটাকে এক থাপ্পড়ে ফোঁকলা না করে ছেড়েছি'।

ডঃ চ্যাটার্জীকে আরও জোরে চেপে ধরে তার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল সে—'লোক হাসাবেন না ডক্। ওকে ফোঁকলা করা সম্ভব নয়। কারণ কাকাতুয়ার দাঁত থাকে না! বরং চড় মারতে গেলে যদি নাকে বা হাতে কিংবা টাকে ঠুকরে দেয়, তবে প্রেস্টিজ বলে কিছু থাকবে না'।

ডঃ চ্যাটার্জী থমকালেন। বোধহয় মনে পড়ে গেল, পক্ষী শ্রেণীর বত্রিশপাটি দাঁত থাকে না। তারপর নিরস্ত হয়ে বললেন—'ঠিক আছে। ওটাকে ছাল ছাড়িয়ে নুন মাখিয়েই খাবো'।

'কাকাতুয়াটা একটা ক্লু'। অধিরাজ গম্ভীর মুখ করে বলে—'আপনি কেসের মাঝখানে একটা ক্লু বা এভিডেন্সকে খেয়ে ফেলতে পারেন না'।

'অসহ্য। এটার জ্বালায় জ্বলে মরছি আমি'। ডঃ চ্যাটার্জী নাচতে শুরু করেছেন—'এভিডেন্স তো কী! এটাকে আমার নাকের সামনে রেখে দিতে হবে এমন দিব্যি তোমায় কে দিয়েছিল! কী ভাবো! আমি কিছু বুঝি না? এসব বুলি ওকে কে শিখিয়েছে খুব ভালো ভাবেই জানা আছে আমার'।

অধিরাজ মনে মনে জিভ কাটে। এই রে! বুড়ো ধরে ফেলেছে।

'তোমাকে তো আমি পরে দেখছি'। ডঃ চ্যাটার্জী তীব্র লেসার দৃষ্টিতে অধিরাজকে আধপোড়া করে দিয়ে বললেন—'আপাতত কাজে ফিরে আসি। মার্ডার ওয়েপন্‌টা ভোজালিই তাতে কোনও সন্দেহই নেই। ওর ওপরে যে রক্ত আছে, তা ভিকটিমের ব্লাডের সঙ্গে ম্যাচ করেছে। স্ট্যাবিং এর কারণে মৃত্যু হয়েছে ঠিকই—কিন্তু বারোবার না মারলেও চলত। বড়জোর তিনটে মোক্ষম কোপই যথেষ্ট। তাতেই মরে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। বাকিটা যেন গায়ের জ্বালা মেটাবার জন্য মারা হয়েছে! লোকটা যেই হোক্, ভিকটিমের ওপরে তার রাগ বলো, বা ঘৃণা বলো—একদম এক্সট্রিমে!'

'বুঝলাম'। ডঃ চ্যাটার্জী না বললেও একথাটা সে আগেই বুঝেছে। অসম্ভব রাগ বা ঘৃণা না থাকলে কেউ এরকম নৃশংস ভাবে খুন করে না।

'আর কিছু পেলেন?'

' একটা ক্লু হয়তো তোমাকে এখনই দিতে পারি। যে খুনীর খোঁজ তোমরা করছ, সে সম্ভবত পুরুষ নয়। মহিলা! তাও কমপক্ষে ষাট বছর বয়েসী বৃদ্ধা মহিলা হবে।'

অধিরাজ হতভম্ব হয়ে যায়। মহিলা খুনী! একজন বৃদ্ধা মহিলা বারোটা স্ট্যাব করে ভদ্রলোককে খুন করেছেন! সে বিস্মিত হয়ে বলে—'বৃদ্ধা মহিলা! অসম্ভব!'

'হ্যাঁ, মহিলা'।

boierpathshala.blogspot.com

‘কিন্তু ডক্ এখন যে আমিই ভজুয়া হয়ে যাচ্ছি! একজন বয়স্কা মহিলা বারোবার স্ট্যাব করে একজন লোককে মারবেন!’ অধিরাজ মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল—‘এটা একটু বেশিই হাইজাম্প লংজাম্প হয়ে যাচ্ছে না?’

‘সেটাই তো আশ্চর্য ব্যাপার’। তিনি ফরসেপ দিয়ে খুব সূক্ষ্ম একটা লম্বা সাদা চুল তুলে ধরলেন—‘ভালো করে দেখ। এই চুলটা ভিক্‌টিমের গায়ে পেয়েছি। এমনিতে লাশের গায়ে বিড়াল, কুকুরের লোম, পাখির পালক—সবই আছে। কিন্তু এটাই একমাত্র ফরেন স্যাম্প্‌ল্। একজন মহিলার চুল। অফকোর্স এটা রুমা বসুর নয়। কারণ চুলটা কোনও বয়স্ক মহিলার। একদম ফকফকে সাদা চুল। এরকম পাকা চুলের মালিকের বয়স কমপক্ষে ষাট! রুমা বসুর চুল কুচকুচে কালো’।

‘মহিলার চুল বুঝলেন কী করে?’ সে চোখ কুঁচকে তাকাচ্ছে—‘পরীক্ষা করেছেন?’

‘ইডিয়ট!’ ধম্‌কে উঠলেন ডঃ চ্যাটার্জী—‘লম্বা চুল দেখছ না? পরীক্ষা না করেই বলে দেওয়া যায়। এত লম্বা চুল কখনও কোনও পুরুষের হয়?’

অধিরাজ আরও গম্ভীর মুখে বলে—‘কেন? পনিটেলওয়ালা পুরুষ হতে পারে না? আজকাল ছেলেরাও লম্বা চুল রাখে!’

‘এ আবার কী কথা! ছেলেরা মেয়েদের মত চুল রাখবে কেন?’

‘কী আশ্চর্য! আপনার নেই বলে কি আর কারোর থাকতে পারে না?’

ডঃ চ্যাটার্জীর বাকি ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টরা প্রয়োজনের তুলনায় আরও বেশি গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ডঃ চ্যাটার্জী তাদের দিকে কটমট করে তাকাতেই সবাই মুখ নামিয়ে নিল।

‘তা অবশ্য ঠিক’। তিনি আপনমনেই বিড়বিড় করেন—‘ছেলে কী মেয়ে আজকাল স্টাইলের ঠ্যালায় বোঝাই দায়। আজকাল তো ছেলেরা কানে দুল, হাতে চুড়িও পরছে। সালোয়ার কামিজের মত ওড়না দিয়ে পাঞ্জাবি পরছে। কবে কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরবে সেটাই দেখার...!’

অধিরাজ মৃদুস্বরে বলল-‘ হুম্’।

‘হুমহাম না করে একটু অপেক্ষা করো। তোমার চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করে দিচ্ছি’। তিনি চুলটাকে মাইক্রোস্কোপের নীচের স্লাইডে সাইজ করে রাখতে রাখতে বললেন—‘কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বলে দিচ্ছি চুলটা ছেলের না মেয়ের’। এবার ভদ্রলোক চোখ রেখেছেন মাইক্রোস্কোপে। হাতের আঙুল মাইক্রোস্কোপ নড়াচড়া করে সেট করছে—‘ফোর হান্ড্রেড এক্স এ সেট করলাম। এখনই বেরিয়ে যাবে তোমার খুনী পুরুষ না মহিলা না...!’ বলতে বলতেই থম্‌কে গেলেন তিনি। এমনভাবে অধিরাজের দিকে তাকালেন যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছেন না! ব্যোম্‌কে গিয়ে দু-তিনবার ফের মন দিয়ে দেখলেন। তার স্খলিত ঠোঁট চুইয়ে প্রবল বিস্ময়ে উচ্চারিত হল একটাই শব্দ—‘ঘোড়া!’

অধিরাজও তার অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছে। বিস্মিত হয়ে বলল—‘কী? ঘোড়া! খুনী একটা ঘোড়া!’

‘খুনী কিনা জানি না!’ তিনি মাইক্রোস্কোপ থেকে মুখ তুললেন—‘বাট্ আই অ্যাম সরি। আই উইদ্ ড্র। এটা কোনও বৃদ্ধ মানুষের পাকা চুল নয়, বরং কোনও সাদা ঘোড়ার চুল। মানুষের হলে এটার মেডুলা ফ্র্যাগমেন্টেড আর সরু হত। কিন্তু এই চুলের মেডুলা যথেষ্ট চওড়া! মেডুলা প্যাটার্ন আর কিউটিক্‌ল প্যাটার্ন দেখেই আমি চোখ বুঁজে বলে দিতে পারি—এটা মানুষের চুল তো নয়ই। বরং ঘোড়ার লেজের চুল!’

‘ঘোড়ার লেজের চুল!’ অধিরাজকে যেন কেউ এইমাত্রই ধাক্কা মেরে এভারেস্ট থেকে ফেলে দিয়েছে। স্তম্ভিত,

boierpathshala.blogspot.com

বিহ্বল কন্ঠে বলল—'কিন্তু ঘোড়া এর মধ্যে এল কোথা থেকে?'

'আমি কী করে বলব?' ভদ্রলোক এবারে আক্ষরিক অর্থেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠেছেন—'যে লোক এতগুলো কুত্তা-বিল্লি পোষে, দেখ গে—সে হয়তো ঘোড়াও পোষে!'

'ডক্'। অধিরাজ আপত্তি করে—'ঘোড়া কুকুর বিড়াল নয় যে ঘরের চৌহদ্দিতে ঘুরঘুর করবে। তাছাড়া ঘোড়া পোষার খরচ জানেন? পুষলেই হয় না। তার জন্য আলাদা আস্তাবল, রাঞ্চ লাগে। কাকাতুয়া, কুকুর, বিড়াল পোষার চেয়ে অনেক কস্টলি!'

'তাহলে হয়তো রেসকোর্স থেকে এসেছে'। ডঃ চ্যাটার্জী একটু ভেবে বক্তব্য পেশ করলেন—'লোকটার রেসকোর্সে যাওয়ার অভ্যাস ছিল। হয়তো কোনও ঘোড়ার ...'?

' কোনও ঘোড়ার কী? ল্যাজ ধরে টানাটানি করেছেন?' অধিরাজ হো হো করে হেসে উঠল—'ওঃ ডক্ এটা হাইট! রেসকোর্সে গিয়ে ভদ্রলোক কথা নেই বার্তা নেই ঘোড়ার ল্যাজ ধরে টানাটানি করলেন। তারপর সেই লম্বা চুল একমাস ধরে নিজের গায়ে লাগিয়ে রাখলেন। এর মধ্যে স্নান করলেন না, সাবান মাখলেন না, শ্যাম্পু করলেন না! চুলটা একদম ফেভিকুইকের অ্যাডের মত গায়ে লেগেই রইল একমাস যাবত'।

'একমাসের কেসটা কী?'

সে হেসে ফেলল—'এই তো মুশকিল ডক্। আপনি কখনও রেসকোর্সে যান্ না। তাই জানেন না। ক্যালকাটা রেসকোর্সে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর অবধি টানা রেস চলে। তারপর আবার নভেম্বর থেকে শুরু করে মার্চ অবধি টানা। এটাই রয়্যাল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের নিয়ম'।

'তো?' ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ টাক চুলকে নিয়ে বললেন—'ব্যাপারটা তবু ক্লিয়ার হল না। একটু এক্সপ্লেইন করো'।

'টার্ফ ক্লাবের শিডিউল অনুযায়ী সেপ্টেম্বরে লাস্ট রেস হয়ে গিয়েছে। এখন নভেম্বর এর ফার্স্ট উইক রান করছে। রেস এই উইক এন্ড থেকে শুরু হবে। এখনও হয়নি। অর্থাৎ প্রায় একমাস ক্যালকাটা রেসকোর্সে কোনরকম ঘোড়দৌড়ই হয়নি। অতএব ভিক্টিমের গায়ে যদি রেসকোর্স থেকে ঘোড়ার রোম বা চুল লেগে থাকে, তবে সেটা একমাস আগে। অর্থাৎ...!'

'ইম্পসিব্ল্!' ডক্টর কিছুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবলেন। তারপর ধীরে সুস্থে বললেন—'রাজা, এমনও তো হতে পারে যে খুনীর সঙ্গে ঘোড়ার কোনও সম্পর্ক আছে'।

'হতে পারে। আগে ভেবেছিলাম কিলার বাইকে চড়ে। এখন তো মনে হচ্ছে ঘোড়াতেও চড়ে'। অধিরাজ চিন্তান্বিত—'খুনীকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না। খুনটা কেন হল বুঝলাম না। গ্রাফিটিতে 'হেট ইউ বাবা' শব্দটা কেন লেখা—তাও অধরা! হিসেবমতন ও সোসাইটিতে মোট আটজনের বাইক আছে। কিন্তু তাদের কেউ খুনটা কেন করবে বুঝতে পারছি না'।

'কিলার তো বাইরেরও কেউ হতে পারে'।

'পারে না ডক্'। অধিরাজ একটা সিগারেট বের করে অন্যমনস্কভাবে প্যাকেটের গায়ে ঠুকছে—'আপনি স্নিফার ডগদের কান্ডটা দেখেননি। কুকুরের টিমটা প্রথমে হুড়মুড় দুড়দাড় করে লোহার সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ল ঠিকই, কিন্তু সোসাইটির বাগান অবধি গিয়ে থম্কে গেল। তারপর পাগলের মত ব্যাক করে ফের সামনের সিঁড়ি বেয়ে দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে পৌঁছল ক্রাইম সিনে! অর্থাৎ খুনী লোহার সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু বাগানে গিয়ে ফের ব্যাক করেছে। সম্ভবত বাগানের অন্ধকারে ড্রেস চেঞ্জ করেছে। হোস্পাইপের জলে হাত-পা ধুয়েছে। এবং ভালো প্রতিবেশীর মত গুটিগুটি ফের চলে গিয়েছে প্রিয়মদের ফ্ল্যাটে। এটা কোনও বাইরের লোক, বা ভাড়াটে

boierpathshala.blogspot.com

খুনী করবে না। আমি এখানেই বাইরের খুনী বা ভাড়াটে খুনীর চান্সটা বাদ দিয়েছি। ও সম্ভাবনাটা একেবারেই নেই। যদিও খবরিদের নেটওয়ার্ক অ্যাক্টিভেট করা হয়েছে। কিন্তু মনে হয় না কোনও ইতিবাচক খবর আসবে। এ কাজ বাইরের কারোর নয়। ভাড়াটে খুনীর সম্ভাবনাটা স্রেফ ডেড-এন্ড'।

'তবে?'

'আপাতত অর্নব গিয়েছে ফাটা তুবড়ি আর ভিকটিমের পার্টনার শিবু দাসকে নেড়ে চেড়ে দেখতে। দেখা যাক্ ঐ সাইডে কোনও খবর হয় কি না!' অধিরাজের কন্ঠস্বরে হতাশা—'আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে—ওখানেও কিছু পাওয়া যাবে না। ওটাও ডেড-এন্ডই হতে চলেছে। শিবু দাস বা ফাটা তুবড়ির কেস হলে লুটপাট হত, বাচ্চা ছেলেটাও বাঁচত না! তবু, সব দিকটাই দেখে নেওয়া ভালো'।

'ওটাও যদি ডেড-এন্ড হয়?' ডঃ চ্যাটার্জীর চোখে প্রশ্নচিহ্ন—'তবে কী করবে?'

'তবে আবার সব নতুন করে শুরু করতে হবে'। সে সিগারেট ধরিয়ে অন্যমনস্ক স্বরে বলল—'সেক্ষেত্রে অন্যদিক দিয়ে তদন্ত চালাতে হবে। কিন্তু আমার কেন জানি না মনে হচ্ছে—এই কেস প্রথমবার ঘটছে না। এবং এটাই শেষ নয়! সবে তো কলির সন্ধ্যে...!'

বলতে বলতেই অধিরাজ কাকাতুয়াটার দিকে অসহায় দৃষ্টিপাত করে বলে—'একবার যদি বুঝতে পারতাম প্রিয়ম্ এই কাকাতুয়াটাকে দেখিয়ে কী বোঝাতে চাইছিল...! এই কাকাতুয়াটার মধ্যে কী রহস্য আছে কে জানে...!'

কাকাতুয়াটা তার দিকে তাকিয়ে গ্লপ গ্লপ করে অদ্ভুত একটা আওয়াজ করল। পরক্ষণেই বলে উঠল—'ছাল ছাড়িয়ে, নুন মাখিয়ে...!'

'এই নাও...এই হচ্ছে রহস্য'। ডঃ চ্যাটার্জী টাক চাপড়ে বললেন—'ও হচ্ছে শশার হকারগুলোর কুম্ভে হারিয়ে যাওয়া জুড়ুয়া ভাই। এটাই বিগেস্ট মিস্ট্রি'।

'ফাটা তুবড়ি গত একসপ্তাহ ধরে জেলে আছে স্যার। একটা কিডন্যাপিং এর কেসে ও প্রাইমারি সাসপেক্ট। গত সাতদিন ধরে ও পুলিশ কাস্টডিতে আছে'।

অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ফাটা তুবড়ির সম্ভাবনাও গেল। সে চকিতে জানতে চায়—'শিবু দাস?'

'তার খবরও নিয়েছি। সে গত পনেরোদিন ধরে এক বেসরকারি নার্সিং হোমে ভর্তি। ডেঙ্গু হয়েছে। প্রথম সাতদিন খুবই সিরিয়াস ছিল। এখন একটু বেটার। ডাক্তারের পারমিশন নিয়ে কথা বলেছি। রঞ্জিত বসুর খুনের খবরটা ও আগে থেকেই জানত। টিভিতে দেখেছে। খুব দুঃখ পেয়েছে বলে মনে হল না ঠিকই...'। একটু থেমে বলল অর্নব—' কিন্তু সে এই অবস্থায় খুন করবে বা কাউকে দিয়ে খুন করাবে, ঠিক বিশ্বাস হয় না'।

'আমারও মনে হয় না'। অধিরাজ চিন্তামগ্ন কন্ঠস্বরে বলে—'এ কেস কোনও সাধারণ খুনের নয় অর্নব। কোথাও কিছু একটা প্যাঁচ আছে যেটা আমরা বুঝতে পারছি না'।

অর্নব আজ সারা শহর চষে ফেলেছে। খবরিরা কেউ তেমন কোনও খবর দিতে পারেনি। তাদের কাছে কোনও সুপারি দেওয়ার খবর নেই। মোহন নামের এক খবরি জানাল—'স্যার, বাইরের কোনও উড়ো পাব্লিক বা ফ্লাইং কিলার হলে বলতে পারব না। কিন্তু এখানকার কোনও সুপারিকিলার কাজটা করলে এই মোহন খবরির কানে কিছু না কিছু ঠিকই আসত। দায়িত্ব নিয়ে বলছি স্যার, স'ও টাকার কথা—এ কাজ লোক্যাল কোনও লোক করেনি। তাছাড়া কেসটার কথা আমি খবরের কাগজে পড়েছি। যেভাবে খুনটা হয়েছে তাতে মনে হয় না এ সুপারিকিলারের কাজ। কোনও ভাড়াটে পাব্লিকের ইস্টাইলই নয় এটা! আমি সুপারি কিলারদের চাপ্পা চাপ্পা

boierpathshala.blogspot.com

জানি। ভাড়াটে খুনী হলে বাচ্চাটা বাঁচত না'।

চিন্তার ভাঁজ পড়েছিল অর্নবের কপালে। মোহনের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল সে—'কিছু চেপে যাচ্ছিস্ না তো?'

'মা কসম্ স্যার!' জিভ কেটেছিল মোহন—'এতদিন আপনাদের নুন খাচ্ছি। বেইমানি করব না। তবে স্যার, লোকটার অনেক শত্রু ছিল। সবচেয়ে বড় শত্রু তো ওর বাড়িতেই বসে আছে। ওর বৌ। শুনেছি বৌ এর সঙ্গে সলিড লোচা ছিল। যাকে বলে ছত্রিশের আখড়া। আপনারা বৌটাকেই ধরেন না কেন? হয়তো ও নিজেই বা ওর কোনও ইয়ার কান্ডটা করেছে।'

অর্নবের পরামর্শটা মনে ধরেছিল। এখনও পর্যন্ত এই সম্ভাবনাটাতেই দম সবচেয়ে বেশি। রুমা যদি খুনটা করেন, কিংবা করান—তবে প্রিয়মের গায়ে আঁচড়ও পড়বে না। মা সন্তানকে রেহাই দেবেন, সেটাই স্বাভাবিক। একজন মহিলার পক্ষে কাজটা খুব শক্তও নয়! ডঃ চ্যাটার্জীর কথা অনুযায়ী লোকটি আপাদমস্তক মদে ডুবেছিল। ঐ বেসামাল অবস্থায় প্রতিরোধশক্তি একেবারেই থাকে না। অন্যদিকে রুমার যথেষ্ট শক্তপোক্ত চেহারা। যথেষ্ট লম্বাও। উচ্চতায় প্রায় স্বামীর সমানই হবেন। খুনীর মতই তারও উচ্চতা পাঁচ নয়—থেকে পাঁচ দশের মধ্যে হবে। একটা প্রায় বেহুঁশ, মাতাল লোকের গায়ে ভোজালি দিয়ে বারোটা কোপ বসানো তার কাছে জল-ভাত!

কথাটা বলতেই মাথা নাড়ল অধিরাজ—'উঁহু। ভদ্রমহিলার সেলফোন রেকর্ড তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। মার্ডারের রাতে ভদ্রমহিলার সেলফোন লোকেশন বাঘাযতীনে, ওঁর বাপের বাড়িতেই শো করছে। আর কল রেকর্ডে সন্দেহজনক কিছু ট্রেস করা যায়নি। কোনও সন্দেহজনক ফোন নম্বর, বা মিস্টিরিয়াস কল—কিস্যু নেই। কোনওরকম অ্যাফেয়ার, মানে যাকে মোহন 'ইয়ার' বলছে, তেমন কিছুর খোঁজও পাওয়া যায়নি। একদম ক্লিয়ার। ওঁকে সন্দেহ করার মত উপযুক্ত ডেটা এখনও পাইনি'।

'তবে?'

অধিরাজ হাত দুটো বুকের ওপর জড়ো করল। এই 'তবে' শব্দটা তার অসহায়তাকে আরও বেশি প্রকট করে তুলছে। ভোজালিটা বা পিৎজার বাক্স থেকেও কিছু পাওয়া যায়নি। ভোজালিটা চোরবাজার থেকে কেনা। অতএব ক্রেতাকে ট্রেস করার কোনও উপায় নেই। এরকম হাজার হাজার শৌখিন ভোজালি, কুকরি ওখানে পাওয়া যায়। অনেকেই শখ করে কেনেন। কাকে কাকে মনে রাখবে বিক্রেতারা? পিৎজার বাক্সটা অবশ্য পিৎজা কর্নার থেকে নেওয়া। কিন্তু এরকম প্যান পিৎজা উইথ মোজারেলা চিজ টপিংস রোজই শ'য়ে শ'য়ে বিক্রি হয়। সৌভাগ্যবশত পিৎজা কর্নারের সবক'টা পার্লারেই সিসিটিভি আছে। খুনের তিনদিন আগে থেকে আজ রাত আটটা অবধি শহরের সমস্ত পিৎজা কর্নারের দোকান থেকে সব রেকর্ডিং নিয়ে এসেছে অর্নব। এখন সেটাই ভরসা।

অধিরাজ সিসিটিভি ফুটেজগুলো মন দিয়ে দেখতে দেখতে বলে—'এরকম ঘটনা আগে ঘটেছে কিনা সে খোঁজটা নিয়েছ?'

অর্নব লজ্জায় অধোবদন হয়ে গিয়েছে। অনেক কাজের ভিড়ে সে এই খবরটাই নিতে ভুলে গিয়েছে। তার অবস্থা দেখে অধিরাজ হাসল—'লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই অর্নব। আমার মনে হয়েছিল এরকম কিছু একটা ঘটবে। কাজের প্রেশারে তুমি ভুলে যেতেই পারো। আমি অলরেডি সমস্ত থানায় বলে রেখেছি। ওরা গত পাঁচবছরের রেকর্ড ঘেঁটে দেখছে। পেলেই যোগাযোগ করবে। একটু অ্যালার্ট থেকো'।

'ইয়েস স্যার'।

অর্নব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। অফিসার ব্যানার্জীর সঙ্গে কাজ করার এটাই সুবিধা। স্যার অন্যান্য অফিসারের চেয়ে অনেক বেশি মানবিকগুণ সম্পন্ন ও ঠান্ডা মেজাজের মানুষ। অন্য কেউ হলে তো পান থেকে চুন খসলেই

boierpathshala.blogspot.com

চিৎকার করে রাখত না!

'স্যার, সিসিটিভি ফুটেজ থেকে কি কিছু পাওয়া যাবে?' সে একটু হতাশ হয়েই বলে—'খুনী ভীষণ চালাক। সে কি জানত না যে পিৎজা কর্নারে সিসিটিভি আছে? তাছাড়া এতগুলো ব্রাঞ্চের মধ্যে কোন্‌টায় সে গিয়েছিল তাই বা কী করে জানব? জানলেও আন্‌নোন কিলারকে চিনব কী করে?'

'গুড পয়েন্ট অর্নব। সে নিশ্চয়ই জানত যে পিৎজা পার্লারে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে। আর জানত বলেই তাকে চেনা সহজ হবে। সে নিজেই নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। আর সেই চেষ্টাই তাকে চিনিয়ে দেবে'। সে নিবিষ্টমনে ফুটেজগুলো দেখতে দেখতে বলে—'সব ক'টা ব্রাঞ্চের ফুটেজই দেখছি বটে, কিন্তু একবার খুনীর পয়েন্ট অব ভিউ থেকে ভেবে দেখো। তুমি যদি খুনী হতে তবে কী করতে? কোথা থেকে পিৎজাটা কিনতে?'

'খুব কাছের দোকানে যেতাম না স্যার। অন্তত ধারে কাছের যে দোকানগুলোয় পুলিশ ডেফিনিট্‌লি ইন্টারোগেট করবে সে দোকানগুলো ছেড়ে অন্য কোনও জায়গা থেকে কিনতাম'।

'ঠিক তাই'। সে মাথা ঝাঁকায়—'আমি খুনী হলে মেইন রোডের ওপরের দোকানগুলো থেকে কিনতামই না। বরং এমন পিৎজা পার্লার বেছে নিতাম যেগুলোতে ভিড় কম। যেগুলো সামান্য ইন্টেরিয়রে আছে এমন পার্লার থেকেই পিৎজা নিতাম'।

'এমন পার্লার তো খুব বেশি নেই স্যার'। অর্নব বলল—'বড়জোর গোটা দশেক'।

'ঐ দশটা পার্লারের ফুটেজই হবে আমাদের মেইন টার্গেট। আগে ওগুলোই দেখে নিই। তারপর প্রয়োজন পড়লে বাকিগুলোও দেখতে হবে'। অধিরাজ ফুটেজ দেখা শেষ করে কম্পিউটার থেকে বের করে নিল সিডিটাকে। অর্নবের দিকে তাকিয়ে বলল—'চালাও'।

এরপর যা হল তাকে এক কথায় বলে খড়ের গাদায় সূঁচ খোঁজা! এক এক করে পুরো ছ'টা দোকানের প্রায় পাঁচ ছ দিনের ফুটেজ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখল ওরা। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! কোথাও কোনও সন্দেহজনক কিছু নেই।

সাত নম্বর সিডিটা যখন চালাল অর্নব ততক্ষণে প্রায় রাত একটা বেজে গিয়েছে। সম্ভবত আজ দুই অফিসারের কেউই বাড়ি ফিরবে না। গোটা অফিস শুনশান। শুধু এই কেবিনেই আলো জ্বলছে। অধিরাজের চোয়াল শক্ত! এরমধ্যেই একের পর এক শেষ হয়ে গিয়েছে এক ডজন কফির কাপ। অ্যাশট্রে সিগারেটের ছাই আর অবশিষ্টাংশে উপচে পড়ছে। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। প্রবল জেদে একের পর এক সিডি দেখে চলেছে। যত রাতই হোক্‌, এমনকি রাত পেরিয়ে ভোর হলেও হয়তো কিছু এসে যায় না। অদ্ভুত এক রহস্যময় হত্যাকারীর পিছু করছে সে। যাকে জানা তো দূর, যার মনের তলও পাওয়া যাচ্ছে না—এমন এক দুষ্কৃতীর পিছনে ছুটছে অধিরাজ। এখনও সামনে ঘুটঘুটে অন্ধকার। যেদিকেই যাচ্ছে, সেদিকেই ডেড-এন্ড! তবু হাল ছাড়বে না!

রুদ্ধশ্বাসে আরও একঘন্টা কেটে গেল। পিৎজা পার্লারে বহু লোক কেনাকাটা করছে। ছেলে-মেয়ে, বাচ্চা-বুড়ো কেউ বাকি নেই! কিন্তু কোথায় সেই হত্যাকারী! অর্নবের এবার অসহ্য লাগতে শুরু করেছে। তার মনে হচ্ছে গোটাটাই পন্ডশ্রম! এর মধ্যে কীকরে চিনবেন স্যার লোকটাকে? হয়তো সে দিব্যি ভিড়ের মধ্যে মিশে কাজ হাসিল করে বেরিয়ে গিয়েছে! হয়তো এর মধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজে তাকে দেখা গেছে। অথচ ওরা কেউ চিনতে পারেনি! এ যে বুনো হাঁসের পিছনে তাড়া করা! কোন্‌ অসম্ভবকে সম্ভব করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন স্যার...!

'এই তো...এই তো!' দেখতে দেখতেই লাফিয়ে উঠল অধিরাজ—'পজ্‌ অর্নব! পজ্‌ করো...!'

অর্নব একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। তাই লক্ষ্য করেনি। কিন্তু অধিরাজ প্রায় শিকারীর মতন ওঁৎ পেতে বসে দেখছিল। তাই পিৎজা পার্লারের কিছু ক্রেতাদের মধ্যে এক হেলমেটধারী ব্যক্তির আগমন চোখ এড়ায়নি তার। পর্দায় ভেসে উঠেছে এক কালো হেলমেটওয়ালা লোকের প্রতিচ্ছবি। পিৎজা কর্নারের কাচের দরজা ঠেলে সে

boierpathshala.blogspot.com

ভেতরে ঢুকছে!

‘এই হচ্ছে আমাদের মক্কেল!’ সে উত্তেজিত, অধীর কণ্ঠে বলল—‘খুনের দিনই ইনি হেলমেট পরে পিৎজা কিনছেন! ইনিই তিনি না হয়ে যান্ না! সম্ভবত প্যান পিৎজা উইথ মোজারেলা চিজ টপিংসই কিনবেন। একটু জুম করো। এতটা জুম করো যাতে কী পিৎজা নিলেন, সেটা মোটামুটি দেখা যায়’।

‘ইয়েস স্যার!’

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে অধিরাজের আশঙ্কাই সত্যি। কালো হেলমেট ও কালো জ্যাকেট পরা লোকটা প্যান পিৎজা উইথ মোজারেলা চিজ টপিংসই কিনল। উত্তেজনায়, উল্লাসে টেবিলের ওপর চাপড় মেরে বলল অধিরাজ—‘এই লোকটাই অর্নব। ডেফিনিটলি এই লোকটাই। সিসিটিভি আছে জেনে যে লোক হেলমেট পরে পিৎজা পার্লারে ঢোকে, সে আমাদের খুনী না হয়েই যায় না! এটা কোন্ ব্রাঞ্চ দেখো তো। কালই এই ব্রাঞ্চে খোঁজখবর নিতে হবে। ভিডিও থেকে লোকটার একটা স্টিল ইমেজ কেটে বের করো’।

অর্নব একটু বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। ভাবতেও পারেনি এভাবে খুনীকে লোকেট করা যাবে। সে প্রায় হাল ছেড়েই বসেছিল। এবার তারও চোয়াল দৃঢ় হয়ে উঠেছে। ইতিবাচক ভাবে মাথা নেড়ে বলল—‘ওকে স্যার’।

অধিরাজ এবার নিজেই হত্যাকারীর ছবিটা জুম করে চোখ কুঁচকে কী যেন দেখছে! একবার রি-ওয়াইন্ড করল! পরক্ষণেই ফার্স্ট ফরোয়ার্ড! বেশ কিছুক্ষণ গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে আস্তে আস্তে বলল—‘একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? লোকটা হেলমেট পরেছে ঠিকই, কিন্তু হেলমেটটা ওর মাথায় ঢলঢল করছে। হেলমেট মাথায় ঢিলে হচ্ছে! আর হেলমেটের বেল্টটা কীভাবে বেঁধেছে দেখেছ! ঠিকমত বেল্টের খাপে খাপটা না আটকে বরং গিঁট দিয়ে বেল্ট দুটো বেঁধে রেখেছে! স্ট্রেঞ্জ! এক্সট্রিম্‌লি স্ট্রেঞ্জ!’

‘স্যার!’ অর্নবের কণ্ঠে অসীম বিস্ময়।

হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিতে দিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে—‘বাইকের লিডটা ফস্কে গেল বোধহয় অর্নব। আমি বাজি ধরে বলতে পারি— লোকটা জীবনে এই প্রথমবার হেলমেট পরেছে! সে হেলমেট পরতে অভ্যস্ত নয়। আর এই হেলমেটটা ওর নিজেরও নয়! আমরা ফালতুই বাইক-রাইডারের পিছনে দৌড়চ্ছি! আর যাই হোক্, এই লোকটার বাইক নেই। থাকতেই পারে না!’

৫.

তখন সদ্য সদ্য দোকান খুলেছে। পিৎজা কর্নারের শাটার কয়েক মিনিট আগেই তোলা হয়েছে। এখনও বউনি হয়নি। কাচের দরজায় প্ল্যাকার্ডে নীল অক্ষরের হাতছানি—‘ওপেন’। বিপরীতের পান, সিগারেট, কোল্ড ড্রিঙ্কসের দোকানটা অবশ্য খুলে গেছে ইতিমধ্যেই। এখন তার দোকানে বেশ ভিড়। ক্রেতারা পান, বিড়ি, সিগারেট কিনতে ব্যস্ত। ফুটপাথে হকাররা এখনও জমিয়ে বসে উঠতে পারেনি। সবে ত্রিপল টাঙাচ্ছে তারা। কেউ হ্যাঙারে জামা কাপড় ঝুলিয়েছে। কেউ ইমিটেশন জুয়েলারির দোকানে চেইন, চুড়ি, দুল, আঙটির ডাব্বাগুলো সাজিয়ে রাখছে। ফুটপাথে ঝাড়ুদার ঝাড়ু লাগাচ্ছে। বেশ কয়েকটা কুকুর হাত-পা ছড়িয়ে নরম রোদের ওম নিচ্ছিল। ঝাঁটার গুঁতো খেয়ে কেঁউমেউ করে পালাল।

পিৎজা কর্নারের কর্মচারীটি ধূপ দিয়ে ঈশ্বর-বন্দনা করছিল। একটা অস্ফুট গলা খাঁকারির শব্দ পেয়ে পিছন ফিরে তাকায়। সেখানে তখন দুই মূর্তি অপেক্ষা করছে। সে উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করে—‘বলুন স্যার’।

boierpathshala.blogspot.com

অর্নব গম্ভীর গলায় অর্ডার দেয়—'প্যান পিৎজা উইথ মোজারেলা চিজ টপিংস'।

'খাবেন না নিয়ে যাবেন?'

'নিয়ে যাব'।

কর্মচারীটি নিস্পৃহ ভাবেই মাথা ঝাঁকায়—'আচ্ছা, গরম করে দেব?'

'দিন'।

সে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যায় মাইক্রোওয়েভের দিকে। অধিরাজ চুপচাপ লোকটার গতিবিধি নিরীক্ষণ করছিল। কিছু কিছু মানুষের মুখ দেখলেই কবিগুরুর 'রোদন ভরা এ বসন্ত, সখী কখনও আসেনি বুঝি আগে' গানটা মনে পড়ে যায়। এই কর্মচারীটির মুখটাও অবিকল তেমনই। মনে হয়, এখনই হয়তো কেঁদে ফেলবে।

পিৎজা মাইক্রোওয়েভে ঢুকিয়ে দিয়ে যখন সে ফিরে এল ততক্ষণে অধিরাজের হাতে একটা ছবি উঠে এসেছে। বলাইবাহুল্য ছবিটা সেই অজ্ঞাত পরিচয় কালো হেলমেট ধারীর। কোনওরকম ভনিতা না করে সে ছবিটা কাউন্টারের ওপরে রেখে বলল—

'ভালো করে দেখুন, এই লোকটিকে চিনতে পারছেন?'

কর্মচারীটি প্রায় আকাশ থেকে পড়ল! একসঙ্গে অন্তত ছ'রকমের এক্সপ্রেশন তার মুখে ছায়া ফেলেছে। সবক'টা এক্সপ্রেশনেই অবশ্য কান্নাটা কমন। কোনওটা ভয় পেয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে যাওয়া, কোনওটা ত্রাসে সাদা হয়ে গিয়ে কান্নাকাটি করার আগের পর্যায়! কোনমতে সবক'টা অনুভূতি মূকাভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করে বলল সে—'কী ব্যাপার? আপনারা কে?'

অর্নব ততক্ষণে আই-কার্ড বের করে এনেছে। কার্ডটা দেখে লোকটা আরও কয়েকগুণ বেশি কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। অর্নব সময় সংক্ষিপ্ত করার জন্য কোনমতে তাদের আসার কারণ ব্যক্ত করে। কর্মচারীটি খুন-জখমের কথা শুনেই এমন ঠান্ডা মেরে গেল যেন কেউ ওকেই খুন করে গিয়েছে! অর্নবের ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, বোধহয় ও নিজেই একটা আস্ত লাশ! শুধু রিগর মর্টিস ধরেনি এখনও!

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে সে মুখ খুলল। শুকনো ঠোঁট জিভ দিয়ে চেটে আমতা আমতা করে বলল—'লোকটা কে তা বলতে পারব না স্যার। আমি ওর মুখও দেখিনি। ও হেলমেট খোলেইনি। কিন্তু ওকে খুব ভালো মনে আছে'।

'মুখ না দেখলেও মনে আছে!' অর্নব ভুরু কুঁচকেছে—'সেটা কীরকম?'

'মুখ দেখিনি বলেই আরো ভালো মনে আছে'। কর্মচারীটি ঠোঁট চেটে বলতে থাকে—'সেদিন খুব ভিড় ছিল। আমি একা সামলাতে পারছিলাম না। অর্ডার ডেলিভারি দিতে সময় লাগছিল। শোরুমের ভিতরটা প্রচন্ড গরম! তার উপর দোকানের এসিটাও কাজ করছিল না। কাস্টমারদের সকলেরই গরম লাগছিল। সবাই ঘেমে নেয়ে একসা! তার মধ্যে এই লোকটা হেলমেট পরে হাজির! আমি মনে মনে ভাবছিলাম, এই ভ্যাপ্‌সা গরমের মধ্যেও ও হেলমেট পরে আছে কেন! লোকে বাইক চালানোর সময় হেলমেট পরে। কিন্তু জীবনে এই প্রথম কাউকে দেখলাম বাইক ছাড়া হেলমেট পরতে!'

'বাইক ছাড়া হেলমেট!' এবার বিস্মিত হওয়ার পালা অধিরাজের—'কী করে বুঝলেন যে বাইক ছাড়াই হেলমেট পরেছিল?'

'বাইক থাকলে কেউ কি ট্যাক্সি ধরে?' লোকটি বলে যেতে থাকে—'সামনের পান, বিড়ি সিগারেটের দোকানটা

boierpathshala.blogspot.com

দেখছেন না? ও ওখান থেকে পান কিনে খেয়েছিল। আমি বলেছিলাম, পিৎজা গরম করে দিতে একটু সময় লাগবে। হাতে অনেক অর্ডার জমেছে, একটু বরং ঘুরে আসুন। তাই ও বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কোল্ড ড্রিঙ্কস আর পান খেয়েছিল। আমি ভাবছিলাম ঐ জগদ্দল হেলমেট মাথায় দিয়ে কোল্ডড্রিঙ্কস খাবে কী করে! কিন্তু আশ্চর্য! লোকটা হেলমেটটা সামান্য তুলে ফাঁক করে স্ট্র'টা মুখে দিয়ে দিব্যি খেয়ে ফেলল। ঠিক একইভাবে পানটাও মুখে পুরল!'

'এর মধ্যে একবারের জন্যও হেলমেটটা খোলেনি?'

'একবারের জন্যও নয় স্যার!' সে চোখ গোল গোল করে বলে—' তারপর একটু পরেই লোকটা ফিরে এল। প্যান পিৎজা নিল। আর বাইরে বেরিয়েই ঠিক এই দোকানের সামনে থেকেই ফ্লাইং ট্যাক্সি ধরল। আপনিই বলুন না স্যার, যার বাইক আছে, সে মরতে ট্যাক্সি ধরবে কেন?'

অর্নব দেখল অধিরাজের চোখ চকচক করে উঠছে। এই সম্ভাবনাটার কথা কালই তার মাথায় এসেছিল। কিন্তু উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ না করে ঠান্ডা গলায় বলল—'লোকটা সম্পর্কে আর কিছু মনে আছে?'

কর্মচারীটি চোখ কুঁচকে কী যেন ভাবল—'হ্যাঁ স্যার। ওর গলার আওয়াজটাও অদ্ভুত ছিল। কেমন যেন। ভয়ঙ্কর গম্ভীর কণ্ঠস্বর! অথচ কড়কড়ে! খুব মেটালিক। যেন কোনও রোবট কথা বলছে। কিংবা কার্টুন ক্যারেক্টার'।

অধিরাজ বুঝল প্রিয়ম্ হেলমেট পাওয়ার রেঞ্জারের দিকে দেখাচ্ছিল কেন। শুধু হেলমেট নয়—লোকটার গলার আওয়াজও হেলমেট পাওয়ার রেঞ্জারের ক্যারেক্টারের মত ছিল। সে একমুহূর্ত চিন্তা করে বলল—'লোকটি ক্যাশে পেমেন্ট করেছিল? না কার্ডে?'

'ক্যাশে করেছিল স্যার'। কর্মচারীটি জানায়—'পুরো পাঁচশো টাকার নোট দিয়েছিল। কিন্তু চেঞ্জ নেয়নি!'

'চেঞ্জ নেয়নি!'

'নাঃ!' সে কাঁধ ঝাঁকায়—'অত লোকের ভিড় একা হাতে সামলাতে গিয়ে আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ক্যাশ কাউন্টারে যে ছেলেটি বসে সে কিছুদিনের জন্য দেশের বাড়িতে গিয়েছে। তাই আমিই দুই দিক সামলাচ্ছি। ঐ লোকটির চেঞ্জ দিতে গিয়ে দেখি লোকটাই নেই। এদিক ওদিক তাকাতেই নজরে পড়ল সে আমার দোকানের সামনে থেকে ট্যাক্সি ধরে চলে যাচ্ছে!'

অধিরাজ মৃদু হাসল—'স্বাভাবিক। তিনি একটু টেনশনে ছিলেন। তাড়াও ছিল হয়তো'। একটু থেমে ফের বলল—'প্যান পিৎজাটা কি গরম হল? আমাদেরও একটু তাড়া আছে দাদা'।

প্যান পিৎজার ঢাউস প্যাকেট নিয়ে পিৎজা কর্নারের বাইরে বেরোল দুজনে। অর্নব কৌতুহলী হয়ে জানতে চায়—'পিৎজাটা কী করব স্যার? এতবড় পিৎজা আপনি আর আমি খেয়ে শেষ করতে পারব না।'

'আমি পিৎজা খাই না অর্নব'। সে স্মিত হাসে!

'সে কী! তবে নিলেন কেন?' অর্নব অসহায় ভাবে পিৎজার প্যাকেটটার দিকে তাকায়—'এবার এটার কী গতি হবে?'

'নিলাম মানবিকতার খাতিরে। সকাল সকাল বউনি না হলে লোকটার পুলিশের প্রশ্নের খোঁচা খেতে ভালো লাগত না। তাই ওর বউনি করেই জেরা করলাম'। বলতে বলতেই ফিক্ করে হাসল অধিরাজ—'ওটার গতি নিয়ে চিন্তা কোর না। ডঃ চ্যাটার্জীকে দিয়ে দেবো। কাকাতুয়াটার পাল্লায় পড়ে কয়েকদিন ধরেই খুব কান্নাকাটি করছে টাকলু। পিৎজা দেখেই মহাখুশি হয়ে গোটাটাই খেয়ে নেবে'।

boierpathshala.blogspot.com

অর্নবও হেসে ফেলল। ডঃ চ্যাটার্জী আর অফিসার ব্যানার্জী—এই দুজন পারেনও বটে। অদ্ভুত সম্পর্ক! সকালেই হয়তো ঝগড়ার চোটে ফাটাফাটি অবস্থা! আশঙ্কা হয়, হয়তো এরপর কেউ কারোর মুখ দেখবে না! কিন্তু আবার বিকেল হতে না হতেই দেখা যাবে দুজনে গলা জড়াজড়ি করে ঘুরছেন! প্রায় দাম্পত্যের মতই সম্পর্ক! স্যারকে সেকথা বলতেই তিনি বলেন—'উঁহু, ওটা দাম্পত্য নয়! দামামাপত্য! সর্বক্ষণই হুহুঙ্কারে বাজছে!'

'আচ্ছা স্যার, ...' অর্নব কৌতুহলী হয়ে জানতে চায়—'পিৎজা কর্নারের লোকটার একটা কথা ঠিক বুঝলাম না! খুনীর কন্ঠস্বর রোবটের মত হবে কেন? কোনও মানুষের গলা কি রোবটের মত হয়? যদি ভেন্ট্রিলোক্যুইজমের মাধ্যমে গলা চেঞ্জও করে থাকে, তবুও কন্ঠস্বর মেটালিক হবে কেন?'

'এর অনেক ব্যাখ্যাই হতে পারে'। অধিরাজ একটু ভেবে বলল—'কিন্তু একটাই সম্ভাবনা এখন মাথায় আসছে। সম্ভবত খুনীর মুখের কাছে, হেলমেটের ভেতরে একটা ভয়েস কনভার্টার উইথ অ্যাম্প্লিফায়ার লাগানো ছিল। অনেক সময় মুখ না দেখলেও স্রেফ গলার আওয়াজে মানুষকে চেনা সম্ভব। খুনী সেই চান্স টুকুও নেয়নি। ভয়েস কনভার্টার লাগিয়ে নিয়েছে'।

'ভয়েস কন্ভার্টার?'

'হ্যাঁ'। সে উল্টোদিকে পানের দোকানের দিকে এগোতে এগোতেই বলে—'আমারও একটা আছে। ঐ গ্যাজেটটার সাহায্যে তুমি তোমার গলা আমূল পালটে ফেলতে পারো। অনেকেই ভয়েস কনভার্টারের মাধ্যমে ভিডিও গেমের ক্যারেক্টার, বা কার্টুন ক্যারেক্টারের গলার আওয়াজ তৈরি করে। ছেলের গলা মেয়েদের মত হতে পারে, কিংবা মেয়েদের গলা ছেলেদের মত। কিংবা লোকটা যেরকম বলছিল, রোবোটিক মেটালিক আওয়াজও বের করা যায় ভয়েস কনভার্টারের সাহায্যে'।

'ও!' অর্নব উত্তেজিত—'তাহলে তো স্যার যে লোকটা ভয়েস কনভার্টার লাগিয়ে এসেছিল, ফুল চান্স আছে যে তার কন্ঠস্বর ঠিক কমন নয়। তার ভয় ছিল গলার আওয়াজের মাধ্যমেও তাকে চিনে ফেলা সম্ভব। নির্ঘাৎ কন্ঠস্বরে এমন কিছু বিশেষত্ব আছে যা দিয়েও আইডেন্টিফিকেশন হতে পারে'।

'একদম ঠিক ধরেছ অর্নব'। অধিরাজ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়—'আর একটা সম্ভাবনাও আছে। হতে পারে খুনী পুরুষ নয়, মহিলা। সে নিজের সম্পর্কে এই তথ্যটি জানাতে চায়না। তাই ভয়েস কনভার্টারের প্রয়োজন পড়েছে'।

অর্নব আমতা আমতা করে—'কিন্তু স্যার, মহিলা হলে বোঝা যাবে না? ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার দেখেও তো বোঝা যায়'।

'লেদার জ্যাকেটে অতটা ধরা পড়ে না'। তার নির্লিপ্ত জবাব—'আবার হতেও পারে যে আমি ভুল ভাবছি। খুনী মহিলা নয়, পুরুষই। শুধু সম্ভাবনার কথা বলছিলাম'।

'ইয়েস স্যার'।

পানের দোকানি অবশ্য খুব বেশি কিছু বলতে পারল না। খুনী তার দোকান থেকে মিষ্টি পান কিনে খেয়েছিল। একটা নয়, বরং একজোড়া! তারপর তাকে দুবার পেমেন্ট করে চলে গিয়েছিল পিৎজা কর্নারের দিকে।

'দুবার পেমেন্ট!' অধিরাজ অবাক।

'হ্যাঁ স্যার! দু বার পেমেন্ট করেছিল'। পানের দোকানি বলল—'একবার প্রথমে অর্ডার দিয়ে। আরেকবার পান খেয়ে। চেঞ্জও নেয়নি। আমি 'ও দাদা...ও দাদা...' করে অনেকবার ডাকাডাকি করেছিলাম। কিন্তু লোকটা কেমন ভূতে পাওয়ার মত হেঁটে চলে গেল। শুনলই না!'

boierpathshala.blogspot.com

‘এখানেও চেঞ্জ নেয়নি!’ অধিরাজ চিন্তিত গলায় বলে—‘স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ! ওখানে পিৎজার দোকানেও চেঞ্জ নেয়নি। এখানে আবার দুবার পেমেন্ট করেছে—চেঞ্জও নেয়নি! এভাবে টাকা ছড়ানোর মানে? জমিদারের নাতি নাকি?’

‘হতে পারে স্যার। হয়তো জমিদারী রক্ত রয়েছে। তাই মেজাজটাও জমিদারি...!’

‘স্যা—র! স্যা—র! দাঁ-ড়া-ন স্যা----র!’

অর্নব আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই বাধা! ওরা দুজনেই অবাক হয়ে দেখল পিৎজা কর্নারের কর্মচারীটি উন্মত্তের মত এদিকেই দৌড়ে আসছে।

‘কী হল আবার!’ অধিরাজের মুখ চিন্তান্বিত—‘ওর নতুন কিছু মনে পড়ল নাকি?’

পিৎজা কর্নারের লোকটা কোনমতে পাগলের মত রাস্তাটা ক্রস করল। তারপরই ছুটে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—‘স্যার! সেই লোকটা!’

উত্তেজনায়, দৌড়ে আসার পরিশ্রমে সে কথা বলতে পারছিল না। কোনমতে তার মুখ দিয়ে বেরোল কয়েকটা শব্দ—‘সেই লোকটা...সেই হেলমেট পরা লোকটা...কড়কড়ে গলা...আবার পিৎজা নিয়ে গেল...এইমাত্রই’।

‘হোয়াট?’ অধিরাজ প্রায় লাফিয়ে ওঠে—‘কোথায়?’

ও একটু দম নিয়ে সামান্য সুস্থ হয়ে বলে—‘দশ সেকেন্ডও হয়নি। লোকটা এবার ট্যাক্সি করেই এসেছিল। ট্যাক্সিটা দাঁড় করিয়ে রেখে তাড়াহুড়ো করে পিৎজা নিল। তারপর বলল—‘অফিসাররা কোথায়? তাদের জানিয়ে দেবেন যে আমি এসেছিলাম! বিতস্তায় দেখা হবে।’ বলেই দৌড়ে ট্যাক্সিতে উঠে গেল!’

অধিরাজ দাঁতে দাঁত পিষল—‘ইঁদুর-বিড়াল খেলা হচ্ছে! দেখাচ্ছি!’

অর্নব স্তম্ভিত! এ কীরকম অপরাধী! নিজেই নিজের অস্তিত্বের জানান দিয়ে যাচ্ছে! এ কি অহঙ্কার! না বোকামি!

উত্তেজনায়, অপমানে লাল হয়ে গিয়েছিল অধিরাজ। তার নাকের সামনে প্রলয়নৃত্য করে চলেছে কোনও অজ্ঞাতপরিচয় খুনী। কিন্তু তাকে এখনও ধরতে পারেনি সে। পিছলে বেরিয়ে গিয়ে লোকটা তাকে ব্যঙ্গ করছে! কী দুঃসাহস! নিজেকে শান্ত করার প্রবল চেষ্টা করতে করতে বলল—‘ট্যাক্সির নম্বর দেখেছেন?’

‘ লাস্ট চারটে নম্বর হাতে নোট করেছি’।

লোকটি হাতের তালুতে ফেল্ট পেন দিয়ে লেখা একটা নম্বর দেখাল।

‘সিক্স থ্রি এইট ফোর! থ্যাঙ্কস্...’। বলতে বলতেই নিজের গাড়ির দিকে পাগলের মত দৌড়ল অধিরাজ। পিছন পিছন অর্নবও। তার হৃৎপিন্ড তখন নেচে নেচে উঠছে। মনে হচ্ছে বুকের পাঁজর ফাটিয়ে এখনই বাইরে বেরিয়ে আসবে। খুনী একদম নাকের নীচ দিয়ে চলে গেল! সে দেখেছে যে ওরা ওখানে জেরা করছে! তাই এমন একটা অদ্ভুত রসিকতা করে চলে গেল!

‘অর্নব’। সিট বেল্টের তোয়াক্কা না করেই ড্রাইভিঙ সিটে বসে পড়ে গাড়ি স্টার্ট করে ফেলেছে অধিরাজ। দাঁতে দাঁত চেপে বলল—‘সিক্স থ্রি এইট ফোর নম্বরের ট্যাক্সিটাকে লোকেট করতে হবে। নজর খোলা রেখো’।

মাথা ঝাঁকিয়ে ইতিবাচক উত্তর দেয় অর্নব। কয়েক সেকেন্ডের ভগ্নাংশেই গর্জন করে উঠল গাড়ির ইঞ্জিন। তারপর বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে গেল ওখান থেকে!

boierpathshala.blogspot.com

তখন সকালের ব্যস্ত ট্র্যাফিক হুড়মুড় করে চলেছে স্কুল, কলেজ, অফিসের দিকে। ওদের গাড়িটা বুলেটের বেগে স্রোত কেটে উল্টোদিকে চলল। সামনে সারি সারি হলুদ রঙের ট্যাক্সি। অর্নব যতগুলো দেখা সম্ভব ততগুলোর নম্বর প্লেট দেখল! কোনটাই সিক্স থ্রি এইট ফোর নয়! তার মনে উত্তেজনার পাশাপাশি আশঙ্কাও কাজ করছিল। ট্যাক্সিটার নম্বর প্লেট যদি ভুয়ো হয়! যদি পিৎজা কর্নারের লোকটি তাড়াহুড়োতে ভুল দেখে থাকে! কিংবা যদি ওদের ভুল রাস্তায় চালনা করার জন্য এটা সুচিন্তিত চাল হয়! আচ্ছা, পিৎজা কর্নারের কর্মচারীটা খুনীর সঙ্গে ষড় করেনি তো...!

চার মাথার মোড়ে এসে রেড লাইটের সামনে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল ওদের গাড়ি! অর্নব তন্নতন্ন করে সামনের ট্যাক্সিগুলোর মধ্যে সিক্স থ্রি এইট ফোর নাম্বারপ্লেটটা খুঁজছে। কিন্তু কোথাও ঐ নম্বরের ট্যাক্সি নেই! গেল কোথায়! আকাশে উড়ে গেল! না পাতালে ঢুকে গেল!

'ঐ তো!' অধিরাজ চাপা উত্তেজিত গলায় বললেন—'ডানদিকের গলিতে ঢুকে যাচ্ছে ট্যাক্সিটা। ঐটারই নম্বর সিক্স থ্রি এইট ফোর! অর্নব...!'

'স্যার!'

'সিট বেল্ট বাঁধো!' তার চোয়াল শক্ত—'সিগন্যাল আর ট্র্যাফিকের নিকুচি করেছে আজ! প্রয়োজন পড়লে ফাইনও দেব।'

অর্নব ভয়ে ভয়ে সিটবেল্ট বেঁধে নেয়। স্যারের র‍্যাশ ড্রাইভিঙের নমুনা সে আগেও দেখেছে। ভগবান জানেন, আজ প্রাণে বাঁচবে কী না!

এরপরই শুরু হল এক দমবন্ধ করা চেজ! অধিরাজ সমস্ত সিগন্যাল ভেঙে গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দিল ডানদিকের গলিতে। একটু আগেই এদিকে ট্যাক্সিটাকে ঢুকতে দেখেছে। এই রাস্তাটা অসম্ভব এবড়ো খেবড়ো! পিচের রাস্তা হলেও একেবারেই মসৃণ নয়। ছোট-বড় বাম্পারে ভর্তি! তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আছে খানা খন্দ! ঝাঁকুনির চোটে প্রাণটা গলায় এসে ঠেকেছে অর্নবের! গাড়িটা ভারি হলেও বাম্পারে ধাক্কা খেয়ে বারবার লাফিয়ে উঠছে! বার দুয়েক ছাতে মাথা ঠুকে গেল তার। তবু টুঁ শব্দটা করল না সে। যেন এইমুহূর্তে তার কোনওরকম বাহ্যচেতনা নেই!

'ট্যাক্সিটাকে দেখতে পাচ্ছ অর্নব!'

'নো স্যার!'

আশ্চর্যের ব্যাপার! ট্যাক্সিটা আবার উধাও। অথচ একটু আগেই এদিকে ঢুকতে দেখা গিয়েছে তাকে।

'ঠিক আছে! যাবে কোথায়! এগিয়ে গিয়েছে হয়তো!'

এই মুহূর্তে যে স্পিডে গাড়ি চলছে তাতে যে কোনও সময়ে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে! সামনে ট্যাক্সিটা না থাকলেও গোটা দুয়েক ট্রাক ছিল। তাদের যেভাবে ওভারটেক করল অধিরাজ তাতে একচুল এদিক ওদিক হলেই দুই মূর্তি সহ গাড়িটাকে আর খুঁজে পাওয়া যেত না! দুটো ট্রাককে বিদ্যুৎবেগে পিছনে ফেলে আরেকটা পাব্লিক বাসকে ছাড়াতেই ট্যাক্সিটা ফের চোখে পড়ল! ঐ তো যাচ্ছে! কোনও সন্দেহই নেই—এটা সেই গাড়িই। এতক্ষণে গাড়িটার পুরো নম্বর দেখতে পেল অর্নব। ডব্লু বি জিরো ফোর এক্স সিক্স থ্রি এইট ফোর! ভিতরে কেউ আছে কিনা দেখা যাচ্ছে না! কিন্তু গাড়িটা একেবারে ফুল স্পীডে চলছে!

'আমি গাড়িটার কাছাকাছি যাওয়ার চেষ্টা করছি'। অধিরাজ বলল—'গাড়িটা রিজেন্ট পার্ক থানার দিকেই যাচ্ছে! এইমুহূর্তে আমরা বাঁশদ্রোণী পুলিশ স্টেশন আর রিজেন্ট পার্কের এলাকার মধ্যে আছি। ওদেরও ইনফর্ম করো! যদি আমরা অ্যাক্সেস না করতে পারি ইন দ্যাট কেস হয় বাঁশদ্রোণী পুলিশ কিংবা রিজেন্ট পার্ক পুলিশ ওকে

boierpathshala.blogspot.com

থামাবে'।

অর্নব বিনাবাক্যব্যয়ে মোবাইল ফোন তুলে নেয়। যে করেই হোক্ গাড়িটাকে থামানো দরকার! সে তাড়াতাড়ি রিজেন্ট পার্ক পুলিশ স্টেশন আর বাঁশদ্রোণী থানাকে ইনফর্ম করে।

'আপনারা কি গাড়িটাকে চেজ করছেন স্যার? রিসেন্ট লোকেশন কী?' রিজেন্ট পার্ক পুলিশ স্টেশনের ওসির কৌতুহলী প্রশ্ন।

'এই মুহূর্তে গাড়িটা হনুমান মন্দির ক্রস করে গেল'। অর্নব কোনমতে জানায়—'আপনারা রেডি থাকুন। ও রিজেন্ট পার্ক পুলিশ স্টেশনের দিকেই যাচ্ছে'।

'ওকে'। ওসি ভরসা দিলেন—'আসতে দিন। আমরাও রেডি থাকছি'।

কর্তব্য শেষ করে ফোন কেটে দিল অর্নব। গাড়িটা ততক্ষণে অনেকটাই কাছে! অধিরাজ দাঁতে দাঁত চেপে স্টিয়ারিং সামলাচ্ছে! গাড়ির গতিবেগ একশো কুড়ি কিলোমিটার ছাড়িয়েছে...!

'আমি ট্যাক্সিটার সাইডে গাড়িটাকে নিয়ে যাচ্ছি'। সে ইস্পাত কঠিন স্বরে বলে—'প্রথমে ড্রাইভারকে থামতে বলবে। তাতেও যদি না থামে স্রেফ টায়ারে গুলি করবে। তারপর যা থাকে কপালে। গট ইট?'

'ওকে স্যার'।

ট্যাক্সিটা এখন প্রায় কয়েক গজ দূরত্বে। অধিরাজ অদ্ভুত ক্ষিপ্রতায় গাড়িটাকে ওভারটেক করল। জানলা দিয়ে মুখ বের করে দেখল অর্নব। ড্রাইভার একজন পাগড়ি বাঁধা শিখ। সওয়ারিও আছে। কিন্তু সওয়ারির দিকে তাকিয়ে উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে গেল তার। যা আশা করছিল ওরা—তা নয়। পিছনে যে বসে আছে সে হেলমেট ধারী নয়। বরং একজন বয়স্কা মহিলা! ভদ্রমহিলার চোখে অনাবিল বিস্ময়! তিনিও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন অর্নবের দিকে! ড্রাইভারটিও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়—

'ও জি, কেয়া দিক্কত হৈ?'

'পুলিশ!' কড়া গলায় হুকুম করল অর্নব—'গাড়ি থামাও'।

'গড্ডি রোকু?' সর্দারজীও হেঁকে বলল—'পর কী হৈয়া?'

'কী হয়েছে পরে বলছি। আগে গাড়ি থামাও'।

'জী সাব'।

এতখানি সহজে গাড়িটাকে থামানো যাবে তা ওরা কেউই আশা করেনি। কিন্তু পুলিশের নাম শুনেই সর্দারজী আর বেগড়বাঁই করল না। বরং একপাশে গাড়িটাকে সাইড করে নেমে এল তাড়াতাড়ি। তার দু চোখে ভয় এবং প্রশ্ন!

'স্যার জী...!' ড্রাইভার বলল—'কী হয়েছে সাব? কোই সিগনাল না তোড়া মৈনু। পেপার্স্ও ঠিকঠাক। কোই গলত বাত না কিয়া! তো ফির্ ক্যায়া হুয়া!'

অধিরাজ আড়চোখে পিছনের দিকে তাকায়। সেখানে যিনি বসে আছেন, তিনি আর যে-ই হোন্, ওদের ইপ্সিত ব্যক্তিটি নয়। সে মনে মনে একটু হতাশ হয়। কিন্তু মুখের একটি পেশীতেও সেই হতাশার ছাপ পড়েনি। সে গম্ভীর স্বরে জানতে চায়--

'তোমার গাড়িতে একটু আগে একজন হেলমেট পরা লোক উঠেছিল?'

boierpathshala.blogspot.com

‘হাঁ জি! উঠেছিল’।

‘তিনি কোথায়?’

‘উয়ো বান্দা তো উতার গয়া!’

উত্তর শুনে দুই অফিসারই হতবাক। অধিরাজ বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে বলে—‘উতার গয়া? কঁহা?’

জবাবে ড্রাইভার যা জানাল তাতে বোঝা গেল যে ‘উয়ো বান্দা’ গাড়িতে উঠেছিল ঠিকই। কিন্তু ‘গড্ডি’ চলতে না চলতেই সে আচমকা কী মনে করে যেন নেমে গেল! ড্রাইভারের ধারণা-- সম্ভবত সে কিছু ভুলে গিয়েছিল, বা ফেলে এসেছিল। কিন্তু একেবারে খালি হাতে ফেরায়নি ড্রাইভারটিকে। বরং উলটে পাঁচশো টাকার একটা কড়কছাপ নোট দিয়েছে! সে অবশ্য নিতে চায়নি। বিনা খাটনিতে ও কারোর কাছে এক পয়সাও নেয় না! কিন্তু ‘বান্দা’ তাকে টাকাটা দিয়েই দৌড়ে চলে গিয়েছিল। কোনও কথাই শোনেনি। তার ধারণা লোকটা ‘থোড়া সান্‌কি’ আছে। এখন কেউ যদি নিজের ইচ্ছেতেই বেশি টাকা দিয়ে দেয়, তাতে ড্রাইভার বেচারির কী দোষ! ক’টা টাকা বেশি আমদানি হয়েছে বলে তার পিছনে পুলিশ লাগবে—এ কেমনতরো কথা!

‘ঠিক আছে, তুমি যেতে পারো’।

সর্দারজী একটা সেলাম ঠুকে সওয়ারি নিয়ে চলে গেল। অধিরাজের মুখে দুশ্চিন্তার ভাব আরও প্রকট।

‘কিছু বুঝলে অর্নব?’

অর্নব কোনও উত্তর না দিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

‘আবার হেলমেটের আবির্ভাব, আবার প্যান পিৎজা!’ তার চোখে বিপন্নতা—‘অর্থাৎ সম্ভবত আরও একটা খুন হতে চলেছে’।

‘স্যার!’ অর্নব শিউরে ওঠে—‘আবার খুন!’

‘হ্যাঁ!’ অধিরাজ ব্যর্থতায়, হতাশায় স্টিয়ারিঙের ওপর চাপড় মারে—‘খুনী বাইরের লোকই নয়! ফালতুই আমরা বাইরে খোঁজ করে মরছি। লিখে নাও, খুনী বিতস্তা হাইট্‌সের ভেতরেই বসে আছে এবং আজই আবার খুন করতে চলেছে। কারণ পিৎজা কাল অবধি ফ্রেশ থাকবে না’।

অর্নব কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারও অসহায় লাগছে। একটা খুন হয়ে গিয়েছে। স্যারের কথা যদি সত্যি হয়, তবে আরও একটা হতে চলেছে। অথচ তাদের কিছু করার নেই। রহস্যের জমাট অন্ধকারের মধ্যে একফোঁটা আলোও দেখা যাচ্ছে না! শিকারী শিকার ঠিক করে ফেলেছে, অথচ তারা এখনও বিশ বাঁও জলে!

‘অল রাইট!’ অধিরাজ বলল—‘খুনীকে আপাতত ছেড়ে দেওয়া যাক্। এখন ফার্স্ট প্রায়রিটি দ্বিতীয় খুনটা আটকানো। অফিসে খবর দাও অর্নব! কয়েকটা দিন বিতস্তা হাইটস্ যেন কড়া পুলিশি পাহারায় থাকে। দরকার পড়লে আজ তুমি, আমি ওখানে নজরদারি করার জন্য সবসময় উপস্থিত থাকব। আর একটা সার্চ অপারেশনের বন্দোবস্ত করতে হবে। কালো হেলমেট আর লেদার জ্যাকেটটা খুঁজে পাওয়া দরকার!’

‘কিন্তু স্যার...!’ সে বিপন্ন স্বরে বলে—‘বিতস্তা হাইটসের রাইট লেফট উইং মিলিয়ে অন্তত নয় নয় করেও পঁচিশ থেকে তিরিশটা পরিবার থাকে। কার কার ওপর নজর রাখব? তাছাড়া সবাই কি সার্চ করতে দেবে?’

‘সার্চ ওয়ারেন্ট থাকলেই দেবে’। অধিরাজ স্তিমিত স্বরে বলে—‘এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। দ্বিতীয় খুনটা যে করেই হোক্ আটকাতে হবে...!’ বলতে বলতেই চরম আফসোসে সে মাথা ঝাঁকায়—‘কে খুন হবে কিংবা খুনটা

boierpathshala.blogspot.com

কেন হতে চলেছে তার আভাস যদি একটুও পেতাম! কিন্তু কিচ্ছু নেই অর্নব! কোথাও কিচ্ছু নেই! আই মাস্ট সে, এবার আমিও বুঝতে পারছি না কী করা উচিত! ফিলিং হেল্পলেস...টোট্যালি হেল্পলেস...!'

#পিৎজা (তৃতীয় কিস্তি)

৬.

অপরাধীর ডায়েরি

খেলা দস্তুরমত জমে গিয়েছে। আশা করিনি এতটা মজা পাব। কিন্তু কখনও কখনও ঈশ্বর আশাতীত বিনোদনের ব্যবস্থা করে রাখেন। আমার কপালেও এন্টারমেইন্ট জুটে গিয়েছে। একদম যাকে বলে চোর পুলিশ খেলা!

ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে চোর-পুলিশ অনেকবার খেলেছি। মা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে একশো গুনত। আর আমি আলমারির ভিতরে বা খাটের তলায় টুক করে লুকিয়ে পড়তাম। মা কিছুতেই আমাকে খুঁজে পেত না। এখন অবশ্য বুঝতে পারি, মা জানত সবই। কিন্তু খুঁজে পেয়েও না খুঁজে পাওয়ার নাটক করত। অপেক্ষা করত কখন আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে কচি কচি দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে বলব—'ধ—প্পা!' ঐ অল্প স্পর্শ, জেতা বাজি হেরে যাওয়ায় মা অদ্ভুত সুখ পেত। সে সুখ মরুভূমির মধ্যে মরীচিকার মত ছিল। আমি আর মা—দুজনে আনন্দে থাকার প্রাণপণ চেষ্টা করতাম। মায়ের মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া ঘাপ্‌সা চুল ছিল। সেই লোকটা মুঠোয় মুঠোয় ছিঁড়েও সে চুলের রাশ শেষ করতে পারেনি। মা সেই কোঁকড়া চুলেই মুখের কালশিটেগুলো ঢেকে নিত। আমার হাতে পায়ে মলম মাখিয়ে দিত। সাময়িক যন্ত্রণা কমত ঠিকই। কিন্তু রাতে আবার সেই লোকটা...আবার সেই মার...!

রিকুর বাবাও একদম একরকম। যখনই ওদের সপরিবারে দেখি, তখনই রিকুর মা আর রিকুকে দেখলে মনে হয় সবসময়ই তটস্থ হয়ে আছে! পার্টিতে গেলে ছেলেটা কেমন যেন কুঁকড়ে থাকে। কোনও খাবার বা পানীয় দেখলে কাতর অথচ আতঙ্কিত দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকায়। যেন অনুমতি ছাড়া লোভনীয় খাদ্যবস্তু স্পর্শ করলেই ওর বাবা বেত পেটা করবে! এই বয়েসেই বাচ্চা ছেলেটা কেমন যেন বুড়োটে হয়ে গিয়েছে। দুদিন আগেই ওর হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়েছে! বেচারি এইট্টি নাইন পার্সেন্ট পেয়ে থার্ড হয়েছে! কিন্তু বাবাটি ওকে বিদ্যেসাগর করেই ছাড়বেন! কেন এইট্টি নাইন পার্সেন্ট! নাইন্টি ফাইভ পার্সেন্ট নয় কেন? কেন ও থার্ড হবে? প্রতিবছর ফার্স্ট না হলে বাবার নাক কাটা যাবে যে!

সেদিন রিকুর নরম পিঠে বেতের লাল লাল দাগ বসে গিয়েছিল। দুদিন ওকে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি। ওর বাবার হুকুম! যতদিন না ফার্স্ট প্রাইজ ঘরে আনছে, ততদিন হয়তো না খাইয়ে শুকিয়ে মারবে। রিকুর দিকে তাকালে কষ্ট হয়! খেলার মাঠে যাওয়া ওর বারণ! যদি বা শৈশবের তাড়নায় মহানন্দে মাঠে নেমেও পড়ে, তবে কপালে বেত! টিভিতে কার্টুন দেখাও অন্যায়! ওর বাবা সব ক'টা কার্টুন চ্যানেল লক করে রেখেছে। এইট্টি নাইন পার্সেন্টকে টেনে নাইন্টি ফাইভ করার জন্য কড়া অনুশাসন দরকার। তাই সকাল থেকে বিকেল অবধি শাসন চলছে! ঘুম থেকে উঠে টুইশন, কোচিং, স্কুল, সাঁতার ক্লাস, অঙ্কের স্যার, ইংরাজি কোচিং ক্লাস করতে করতে ছেলেটা ধুঁকতে থাকে। তারপর রাতে ওর বাবা নিজে পড়াতে বসায়। ছেলেটা তখন প্রচন্ড পরিশ্রমে ঢুলছে। সবসময় ঠিকমতন পড়া বলতে পারে না! আর পান থেকে চুন খসলেই থাপ্পড়ের জোরাল আওয়াজ, অথবা সপাং সপাং বেত!

আমার কষ্ট হয় খুব! ভীষণ কষ্ট হয়! সেই লোকটাও আমাকে এমনই কষ্ট দিত। একদিন রাতে পড়তে বসে বড্ড ঘুম পাচ্ছিল। সারাদিনের ক্লান্তির পর হারামজাদা লোকটা সেদিনও ভীষণ মেরেছিল। পড়তে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলে চোখে লাল লঙ্কার গুঁড়ো ঘষে দিয়েছিল। আমি জ্বালায়, যন্ত্রনায় সারারাত খালি কাটা পাঁঠার মত দাপিয়েছি। সেকেন্ডে সেকেন্ডে চোখে জলের ঝাপ্টা দিয়েছি, এই আশায়, যদি এই আগুনজ্বালা একটু কমে।

boierpathshala.blogspot.com

তিনদিন চোখ খুলে তাকাতে পারিনি...! শুধু কাঁদতে কাঁদতে ঈশ্বরকে ডেকে বলেছি—'সেভ মি...সেভ মি...সেভ মি...!'

কেন এই শাস্তি? কারণ আমি ক্লাস সিক্সের হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষায় ফেল করেছিলাম। স্বাভাবিক! অর্ধেক দিন তো লোকটা আমাদের বন্দী করে রেখে যেত ফ্ল্যাটে। ও যতটা অত্যাচারী ছিল, তার থেকেও বেশি ভিতু! আমি বা মা বাইরে বেরোলেই ধরা পড়ে যাবে ওর কীর্তিকাহিনী। তাই আমাকেও স্কুলে যেতে দিত না শালা! স্কুল থেকে গার্জিয়ান কল করলে যেত, আর ভুজুং ভাজুং দিয়ে আসত প্রিন্সিপ্যালকে। বলত, আমি নাকি অসুস্থ—তাই আমার পক্ষে ক্লাস করা সম্ভব নয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি...! আর ফিরে এসেই আমার ওপর ঝাল ঝাড়ত! দুই আঙুলের মধ্যে পিন ফুটিয়ে চেপে ধরত। বলত—

'শুয়োরের বাচ্চা, নিশ্চয়ই তুই স্কুলে ফোন করে কিছু জানিয়েছিস! নয়তো ঐ হারামী প্রিন্সিপ্যাল আমাকে কথা শোনায়! কাকে কথা শুনিয়েছে? আর কাউকে নয়-- আ-মা-কে! এত লোক থাকতে আমাকে কেন? নিশ্চয়ই তুই আর তোর মা মাগী মিলে কিছু করেছিস্! কী করেছিস্ বল্? কাকে কী বলেছিস্?'

লোকটা আমায় মেরে পাট পাট করে দিয়েছিল...! আমি শুধু খুঁটে বাঁধা গরুর মত মার খেতে খেতে অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম—'সেভ মি...সেভ মি...!'

রিকুর চোখেও সেই প্রার্থনা ঝটপটিয়ে মরছে। ওকে মাঝেমধ্যে ব্যালকনিতে বসে থাকতে দেখি। বিষণ্ণ চোখে নীচের বাগানে সোসাইটির বাচ্চাদের উচ্ছ্বল খেলা দেখছে। নিষ্প্রভ বুড়োটে চোখ দুটো কাতর দৃষ্টিতে সেই জীবনের উৎস'র দিকে তাকিয়ে থাকে। 'তোতাকাহিনী'র খাঁচায় আটকানো তোতাপাখি রোজ কিলোদরে বইয়ের পাতা খেয়ে চলেছে, আর প্রাণপণ খাঁচায় ডানা ঝাপ্টে মরছে। তার দু চোখ বলে চলেছে—'সেভ মি...সেভ মি...সেভ মি...!'

আই উইল সেভ হিম। যদিও পুলিশ আমার প্ল্যান টের পেয়ে গিয়েছে। অফিসার ছোকরার বুদ্ধি আছে বলতে হবে। ইশারাটা ঠিক বুঝেছে। আর যথেষ্ট চটপটেও। এরমধ্যেই গোটা বিতস্তা হাইটসে সাদা পোষাকের পুলিশ মোতায়েন করে দিয়েছে। শুনছি সার্চও হবে! ভাবছি ওর সঙ্গে একটু রসিকতা করলে কেমন হয়।

রিকু, আই উইল সেভ ইউ। যতই পুলিশ নজর রাখুক। তোর বাবাকে তো মরতেই হবে! কেউ ঠেকাতে পারবে না। বিক'জ আই হেট হিম...!

আই হেট ইউ বাবা...!

'ঘন ঘোর ঘোর ঘির আয়ি ঘটা

বন বন শোর কর রহি মোর

সুন মন্দির মে জাগু ম্যায় পিয়া

বির্হন জিয়া তড়পে, ডর পাওয়ে"...

বিতস্তা টাওয়ারের মাথায় বিদ্যুৎ চমকে উঠল। তার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল এস্রাজের সুর! গৌড় মল্লার! বৃষ্টি এখনও নামেনি! কিন্তু গৌড় মল্লারের দ্রুত বিন্দু বিন্দু সুরের ঝাপটা এসে আপাদমস্তক ভিজিয়ে দিল। মুহূর্তের মধ্যে যেন ঝলমলিয়ে উঠল লক্ষ প্রদীপের আলো। কোথাও সম্ভবত বৃষ্টি হচ্ছে। দক্ষিণের বাতাসে তারই মাটি

boierpathshala.blogspot.com

ভেজা সোঁদা গন্ধ। তার সঙ্গে গৌড় মল্লারের গন্ধ মিলে মিশে গোটা বিতস্তা টাওয়ার ম' ম' করে উঠল!

'এস্রাজ!' অধিরাজ বিস্মিত হয়ে বিতস্তা টাওয়ারের সিকিউরিটি সিদ্ধেশ্বরকে প্রশ্ন করে—'কে বাজাচ্ছে?'

সিদ্ধেশ্বর পাঁচন গেলার মত মুখ করে। একেই এখন পুলিশ তোলপাড় করে টাওয়ারের প্রতিটা ফ্ল্যাটে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে! একটু আগেই তার ঘরও সার্চ করে লাল হেলমেট আর লাল উইন্ডচিটার বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তার মধ্যে দুই অফিসার এসে তার মাথার ওপর বসে তদারকি করছে! এখন কানের কাছে গৌড় মল্লারই বাজুক কী হালুম্ব রাগিনী--সবই তার কাছে এক! তবু নেহাত দায়ে পড়ে উত্তর দিচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বলল—'পরাশরবাবু বাজাচ্ছেন। ওঁর বাড়িতে একগাদা যন্তর আছে। সেতার, সরোদ, বেহালা, চেলো, এস্রাজ এমনকি দিলরুবাও আছে। উনি যন্তর পালটে পালটে রোজ সন্ধ্যেবেলাতেই রেওয়াজ করেন। তবে আজ লেফ্‌ট উইং এর থার্ড ফ্লোরে পশুপতিবাবুর বাড়ির আসরে বাজাচ্ছেন'।

'পশুপতিবাবুর বাড়ির আসর? এই সার্চিং অপারেশনের মধ্যেও আসর বসেছে!'

'আজ্ঞে'। সে নির্লিপ্ত মুখে জানায়—'এ ধরাবাঁধা নিয়ম! ভূমিকম্প হোক্, কী বন্যা—কিছুতেই কিছু হয় না। প্রতি শুক্রবারই ওরা কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে পশুপতিবাবুর বাড়িতে আসর বসান। খাওয়া দাওয়া, গান বাজনা—সবই চলে। কখনও তো একসঙ্গে আই এফ এল বা আই পি এলের ম্যাচও দেখেন! রাত দশটা অবধি আসর চলে। তারপর যে যাঁর বাড়িতে চলে যান'।

'মন্দ ব্যবস্থা নয়। অনেকটা স্ট্রেস রিলিফ হয়'। অধিরাজ মুখ টিপে হাসে—'কে কে থাকেন ঐ আসরে?'

'পরাশরবাবু থাকেন, অমিত বাবু, মানে অমিত মুখার্জী থাকেন—পশুপতিবাবু তো থাকবেনই, এছাড়াও ডঃ তেজেন বর্মন, বিপুল রায়, কপিল মিশ্র থাকেন। প্রতি উইক-এন্ডে ওদের জমায়েত হয়। এই যে তবলার আওয়াজটা শুনছেন না, ডঃ তেজেন বর্মন বাজাচ্ছেন। এরপর কপিল মিশ্র বাঁশি বাজাবেন, এছাড়া অমিতবাবু চমৎকার গান গাইতে পারেন...!'

অধিরাজ অনুষ্ঠান সূচী মন দিয়ে শুনছিল। এর ফাঁকেই অর্নব ফিস্‌ফিস্ করে ওঠে—'স্যার, পরাশরবাবু এই টাওয়ারের সেক্রেটারি। ইঞ্জিনিয়ার। একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে বড় পোস্টে চাকরি করেন। ওঁর ফ্ল্যাটে উনি, ওঁর স্ত্রী, ওঁর বাবা-মা থাকেন। আর উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে ওঁর ছেলে-পুত্রবধূ এবং তিন বছরের নাতনী পিঙ্কি থাকে। অমিত মুখার্জী অসম্ভব নাটুকে আর টকেটিভ লোক, পেশায় কেমিস্ট্রির টিচার। ওঁর স্ত্রীও টিচার। বিপুল রায় টিপিক্যাল ভীতু। ইনিও টিচার, তবে বায়োলজির! কোনও সন্তানাদি নেই। স্বামী স্ত্রী'র সংসার। অমিত ও বিপুল একই স্কুলে পড়ান অর্থাৎ সহশিক্ষক। বিপুল সিনিয়র। কপিল মিশ্র আবার ঐ স্কুলেরই ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, ওঁর স্ত্রী হাউসওয়াইফ! কপিল মিশ্র'র বাবা রাশভারি দাপুটে আর্মি অফিসার ছিলেন। ভদ্রলোকের মেজাজ বেজায় কড়া! গুজব যে উনি যৌবনে লাগামছাড়া ছিলেন। মদ, মেয়েমানুষ—কিছুই বাকি ছিল না। তার উৎপাত সহ্য করতে না পেরে নাকি কপিলের মা আত্মহত্যা করেন। অবশ্য ওটা আত্মহত্যা না খুন, তা নিয়েও অনেকের সন্দেহ আছে। শ্রীঘরে বাসও করেছেন কিছুদিন। তাতেও অবশ্য বিশেষ পাল্টাননি ভদ্রলোক। এখনও তার একটি মেয়েমানুষ আছে। সেই নিয়েই রোজ বাপ-ছেলের মারদাঙ্গা হয়। এছাড়া বাকিদের কথাও বাইকের খোঁজ করতে গিয়ে শুনেছিলাম। ডঃ তেজেন বর্মন পশারওয়ালা এম ডি। মানে মেডিসিনের ডাক্তার! পরিবারে বাপ-মা, ভাই বোন কেউ নেই। বিপত্নীক। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে থাকেন। পরাশরবাবু, বিপুল রায়, অমিত, পশুপতিবাবু, ডঃ তেজেন বর্মন, কপিল মিশ্র—এদের সবারই বাইক আছে!'

'ইন্টারেস্টিং'। অধিরাজ বলে—'বাইকার গ্যাং এখন সঙ্গীতে মেতেছে দেখছি। ওদিকে ওদের ফ্ল্যাটে তল্লাশি হচ্ছে, আর ওরা গান-বাজনা নিয়ে মেতে আছেন। এটা কি স্ট্রেস রিলিফ? না অন্যকিছু?'

বিতস্তা টাওয়ারসের মাথায় আবার ঝলসে উঠল বিদ্যুতের নীলাভ জ্যোতি! অল্প অল্প ঝিরঝিরে বৃষ্টিও নামল!

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ আড়চোখে ওপরের দিকে তাকায়। বিতস্তা টাওয়ারসের রাইট উইং-এ এখনও পুলিশের নড়াচড়া চলছে। এ ছাড়াও দু একটা বন্ধ ফ্ল্যাট খুলিয়ে তার ভেতরে ঢুকে বসে আছে সাদা পোষাকের পুলিশ বাহিনী। তারাও ঘন্টায় ঘন্টায় রাউন্ড দিয়ে চলেছে। কোনরকম এদিক ওদিক দেখলেই ফোন করবে। প্রত্যেককেই বলা আছে, কোনও কালো হেলমেটধারী ব্যক্তিকে দেখলেই যেন সঙ্গে সঙ্গে ধরে। সে লোকটা খুনী হোক্ , কি না হোক্-- তার বিচার পরে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনওরকম চান্স নিতে চায় না ওরা।

অধিরাজের কানে লাগানো ব্লু-টুথ ওয়ারলেস সেট কড়কড় করে উঠল। ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এল সার্চ অপারেশনের দায়িত্বে থাকা অফিসারের কন্ঠস্বর—'স্যার, এদিকের কাজ প্রায় শেষ!'

অধিরাজ সিগারেটের প্যাকেট বের করে বলে—'লেফ্‌ট উইঙে চলে যাও। কিছু পাওয়া গেল?'

'গোটা দুয়েক হেলমেট আর জ্যাকেট তুলেছি স্যার। কিন্তু এর একটাও কালো নয়। একটা সাদা, অন্যটা সবুজ'।

'গুড ওয়ার্ক'। সে মনে মনে একটু হতাশ হলেও প্রকাশ করল না—'এখন লেফ্‌ট উইং'।

'ওকে স্যার!'

বৃষ্টিটা এখন একটু জোরে নেমেছে। সিদ্ধেশ্বরের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজার কোনও ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু দুই অফিসার ভেতরের দিকে না গেলে, সেও বা যায় কীভাবে! কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বৃষ্টির ঝাপ্টা সহ্য করল সে। তারপর মিউ মিউ করে বলল—'স্যার, আমার ঘর তো সার্চ হয়ে গিয়েছে। এখন কি আমি একটু ঘরে যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই'।

অনুমতি পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সিদ্ধেশ্বর। দ্রুত পায়ে চলে গেল নিজের ঘরের দিকে।

'লোকটা পুরো অ্যাবনর্মাল!' অর্নব বিড়বিড় করে—'আগেও তো দেখেছি। কেমন যেন একটা'।

'অ্যাবনর্মাল নয়, একটু বেশিই চালাক'। অধিরাজ মৃদু স্বরে বলল—'তার সঙ্গে ভীতুও। পুলিশি ঝামেলায় পড়ে মুষড়ে পড়েছে। বুঝতেও পারছে যে ওকেও সন্দেহ করছি। সেজন্যই পাছে পুলিশ ওকেই অ্যারেস্ট করে বসে, সেই ভয়েই মরছে'।

'আপনার কী মনে হয়? হেলমেটটা পাওয়া যাবে?'

অধিরাজ মৃদু হাসল। সে বৃষ্টিটাকে এড়ানোর জন্য ধীরে ধীরে বিতস্তা টাওয়ারের শেডের নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। অর্নব তখনও উৎসুক হয়ে উত্তরের অপেক্ষা করছে। কিন্তু তখনই উত্তরটা না দিয়ে সে খুব যত্ন করে একটা সিগারেট ধরায়। অর্নব একটু ধৈর্য হারালেও প্রকাশ করেনি। বরং ও তখনও উত্তরের আশায় অধিরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

'আমার ধারণা হেলমেটটা পাওয়া যাবে'। অধিরাজ এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল—'অতবড় একটা হেলমেট লুকিয়ে রাখা মুশকিল। অতএব অবধারিত ভাবেই কালো হেলমেটটা পাওয়া যাবে'।

'তাহলে তো খুনীও...!' উত্তেজিত হয়ে বলল সে। অধিরাজ হেসে ফেলেছে। মাথা নাড়তে নাড়তে বলল—'নাঃ, খুনীকে পাওয়া যাবে না! আমি যদি ভুল না করি তবে হেলমেটটা এমন কারোর কাছ থেকে পাওয়া যাবে যে কোনমতেই খুনী হতে পারে না! কিলার এমন লোকের বাড়িতেই হেলমেটটা লুকিয়ে রাখবে যাকে সন্দেহই করা যায় না! সম্ভবত লেদার জ্যাকেটটাও ওখান থেকেই পাওয়া যাবে।'

'যাঃ!' অর্নব হতাশ—'তাহলে আমরা হেলমেটটা খুঁজছি কেন স্যার? যদি খুনীকে পাওয়াই না যায়, তবে হেলমেট

boierpathshala.blogspot.com

দিয়ে কী করবো?'

'দেখা যাক্'। ও আরেকটা লম্বা সুখটান মেরে বলে—'তুমি আমি হেলমেটটা দিয়ে কিছুই করতে পারবো না। কিন্তু খুনী একজনকে হিসেবে ধরেনি। ডঃ অসীম চ্যাটার্জী, ওরফে দুর্বাসা। বুড়ো মাঝেমধ্যে তাক লাগিয়ে দেয়। যদি এবারও তেমন কিছু করতে পারে সেই আশাতেই এত খোঁজাখুঁজি! হেলমেটধারীকে না পেলেও হেলমেটটা থেকে তার সম্পর্কে কিছু জরুরী তথ্য জানতে পারা অসম্ভব নয়!'

'কিন্তু ডঃ চ্যাটার্জী যে ঘোড়ার লেজের বোমটা ফাটালেন, তার তো কিছুই বোঝা গেল না!'

'নাঃ। এখনও বুঝতে পারিনি'। অধিরাজ কাঁধ ঝাঁকায়—'তবে আমার মনে হয় ওটাও একটা বড় লিড। শুধু আমরা লিডটা ধরতে পারছি না!'

অর্নব কিছুক্ষণ কী যেন ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে বলে—'এমনও তো হতে পারে স্যার, যে কিলার হয়তো জকির কাজ করে। তাই কোনওভাবে...!'

'হতে পারে'। অধিরাজ বলল—'কিন্তু বিতস্তা টাওয়ারে কোনও জকি থাকে বলে এখনও জানি না! অবশ্য যদি কেউ নিজের পেশা গোপন করে থাকে তাহলে অন্য কথা!'

ইতিমধ্যে মেহ্‌ফিলে এস্রাজের সুর থেমে গিয়েছে। তার জায়গায় এখন বাঁশির মন ভোলানো সুর। তার মনে পড়ে গেল সিদ্ধেশ্বরের কথা।

'কপিল মিশ্র বাঁশি বাজাচ্ছেন'। সে একটা শ্বাস টেনে বলল—'খাসা বাজান তো! চল অর্নব, আমরাও মেহ্‌ফিলে ঢুকে পড়ি'।

এই পরিস্থিতিতে গান বাজনা! ওদিকে পুলিশ সবার ঘর-দোর উল্টোপাল্টা করে তল্লাশি চালাচ্ছে, আর স্যারের এখন গান শোনার শখ হল! অর্নব অবশ্য কোনও মন্তব্য করে না। স্যারের সঙ্গে সঙ্গে থেকে সে খুব ভালোমতই জানে যে লোকটা এরকমই। কখন তার কী খেয়াল হবে ঈশ্বরও হয়তো জানেন না!

পশুপতিবাবুর ফ্ল্যাটে ততক্ষণে আসর সরগরম হয়ে উঠেছে। কপিল মিশ্র বাঁশি বাজাতে ওস্তাদ। বাঁশির সুরে, চড়াই উতরাইয়ে ফুটে উঠছে রাগ 'দেশ'এর অবয়ব। উপস্থিত শ্রোতারা থেকে থেকে 'আহা...আহা' করে উঠছেন। তাদের সামনের প্লেটে কচুরী, সিঙারা, পকোড়া, রোস্টেড আমন্ড আর স্যালাড! হাতে গ্লাস। গ্লাসের তরল পদার্থটি সম্ভবত মদ নয়, কোল্ড ড্রিঙ্কস্! অধিরাজ আড়চোখে তাকিয়ে দেখল ঘরে এককোণে 'জিরো কোলা'র ফাঁকা বোতল গড়াগড়ি খাচ্ছে। বিরাট এল ই ডি টিভিতে অবশ্য আই এফ এলের ম্যাচ চলছে! কিন্তু টিভির সাউন্ড মিউট করা! ওদিকে কারোর মনোযোগ নেই। যখন মনে হচ্ছে, আলগোছে স্কোরটা দেখে নিচ্ছেন!

পরাশরবাবু কার্যক্রম শেষ করে ফের নিজের চুলের কেয়ারিটিকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। পকেট আয়নায় মুখ দেখে চিরুনি দিয়ে নিজের বিস্রস্ত চুলগুলোকে ঠিকঠাক করে সাজাচ্ছেন। সম্ভবত এটা ভদ্রলোকের মুদ্রাদোষ। অথবা অতিরিক্ত সৌন্দর্য সচেতনতা। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই চোখ পড়ল দুই অফিসারের দিকে। সন্ত্রস্ত হয়ে বলে উঠলেন—'এ কি! আপনারা!'

কপিল মিশ্র ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাঁশি থামিয়ে দিলেন। বাকিরাও অবাক হয়ে তাকালেন এদিকেই। অমিত মুখার্জীর হাতের গ্লাসটা একটু যেন কেঁপে গেল। বিপুল রায়কে দেখে মনে হল, আচমকা একটা ভ্যাম্পায়ার তার সমস্ত রক্ত শুষে নিয়েছে।

পরাশরবাবুই হয়তো ওদের মধ্যে প্রথম সম্বিত ফিরে পেলেন—'আমাদের ঘর তো সার্চ করা হয়ে গিয়েছে। আর এদিকে এখনও শুরু হয়নি। তাই ভাবলাম এই ফাঁকেই একটু...!' বলেই থেমে গেলেন তিনি। একটু বিরতি দিয়ে

boierpathshala.blogspot.com

বললেন—'এদিকেও কি সার্চ শুরু করবেন আপনারা? উঠব আমরা?'

'না না। ওঠার দরকার নেই! মজলিশ বসিয়েছেন, ভালোই করেছেন। এদিকে যা চলছে, তাতে অল্পবিস্তর স্ট্রেস-রিলিফও হয়ে যাবে'। অধিরাজ একটু অপ্রস্তুত—' তবে আমরা ঠিক সার্চ করার জন্য আসিনি। বরং গানের সুর শুনেই এদিকে চলে এলাম। আপনাদের জলসায় ব্যাঘাত ঘটানোর ইচ্ছে নেই। যদি জানতাম যে আমাদের দেখেই আপনারা গান থামিয়ে দেবেন, তবে হয়তো আসতাম না'।

'এসে যখন পড়েছেন, তখন বসেই পড়ুন'। পরাশরবাবু হেসে ওদের সঙ্গে বাকিদের আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন—'পুলিশ অফিসারেরা যে গান-বাজনা শুনতে ভালোবাসেন তা জানা ছিল না!'

'বলেন কী!' সে প্রতিবাদ করে—'পুলিশ বলে কি মানুষ নই? এই তো আমাদের অর্নবই রীতিমত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ'।

অর্নব ঘাবড়ে গিয়ে অধিরাজের দিকে তাকায়। সে যেন সোজা মহাকাশ থেকে পড়েছে। ঢোঁক গিলে কোনমতে বলে—'আ-মি!'

'ও তো ধ্রুপদ-ধামার-বিলম্বিত শুনতে পেলেই বসে পড়ে। ডোভারলেন কনফারেন্স শুরু হলে ওকে আর অফিসে খুঁজে পাওয়া যাবে না'। সে নির্বিবাদে, নির্লিপ্ত মুখে অর্নবের সঙ্গীতপ্রেম সম্পর্কে যত রকমের বলা সম্ভব—একগঙ্গা মিথ্যে কথা বলে গেল! অর্নব কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে একবার অধিরাজের মুখের দিকে আরেকবার উপস্থিত সঙ্গীত পিপাসুদের দিকে তাকাচ্ছে! ওদের মধ্যে কেউ যদি তাকে পড়া ধরে তাহলেই সে গেছে! যে লোক ইমনে ক'টা মধ্যম লাগে, কিংবা ভূপালি তে 'নিষাদ' লাগে কিনা—তাই ঠিকমতন জানে না, সে নাকি সঙ্গীত বিশারদ! অর্নব জীবনে এই প্রথম জানল যে ধ্রুপদ আর ধামার আলাদা!

অর্নবের কাল্পনিক শাস্ত্রীয় সঙ্গীত প্রেম সম্পর্কে আরও একগাদা মিথ্যে কথা বলতে বলতেই বলল অধিরাজ—' এই তো! একটু আগেই আপনি এস্রাজে যে সুরটা বাজাচ্ছিলেন, ওটা যে গৌড় মল্লার—সেটা অর্নবই আমায় বলল। আরও বলল যে ঐ সুরেই নাকি কবিগুরুর একটা গান আছে'।

'আলবাত আছে'। অমিত মুখার্জী হাঁটুতে চাপড় মারলেন—'ঠিকই বলেছেন অর্নব বাবু। কবিগুরুর 'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো'...গানটা গৌড় মল্লারেই আছে। আপনি তো রীতিমত ওস্তাদ লোক দেখছি। আসুন...আসুন, বসে পড়ুন!'

অর্নব বসবে কী! তার তখন ঘাম ছুটছে! এখনই যদি তাকে গান গাইতে বলে অথবা রাগ জিজ্ঞাসা করে, তবে কী করবে! টেনে দৌড় মারবে? না স্যারের চওড়া পিঠের পিছনে গিয়ে লুকোবে! তার ওপর কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ ভেতর থেকে একটা ভয়ঙ্কর চেহারার বুলডগ এসে রক্তাভ চোখে তাকে নিরীক্ষণ করতে লেগেছে। সুরেলা পরিমন্ডলের মাঝে ঘ্রাউ ঘ্রাউ করে সে এক অশান্তি শুরু করল!

'পল, বেবি—চুপ করো!' পশুপতিবাবু কুকুরটাকে একটা নরম ধমক দিয়ে বললেন—'আজকে ওর শরীরটা ভালো নেই। তাই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে!'

পল আর চুপ করেছে! সে সবার দিকে তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হাউ হাউ করল। তারপর ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখে নিয়ে ফের চিৎকার জুড়ল! ডঃ তেজেন বর্মন অবাক—'কী হল! পল তো এমন কখনও করেনা! গায়ে পোকা হয়নি তো?'

'আর বলবেন না! সকালে ওয়াকে গিয়েছিলাম। একটা স্টুপিড রোডেশিয়ানের সঙ্গে মারপিট করেছে'। পশুপতিবাবু বললেন—'ওদের জাতই আলাদা! রাস্তার কুকুরের সঙ্গে মারপিট কি পোষায়? রোডেশিয়ানটা পায়ে কামড়ে দিয়েছে! সেই নিয়ে হুলুস্থুলু আর কী! ঐ তো দেখুন, পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা!'

boierpathshala.blogspot.com

‘আহা রে! অবলা জীব!’ পরাশরবাবু পল্ কে কাছে টেনে নিলেন—‘আয় বাবা, আমার কাছে আয়। সুড়সুড়ি দিয়ে দিই। আরাম পাবি’।

আর অবলা জীব! অর্নব ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। কুকুরটার যা হুমদো চেহারা! তাতে ঘ্যাঁক করে কামড়ে টামড়ে না দেয়! এখন সে এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচে! অথচ অধিরাজ কিন্তু দিব্যি আয়েশ করে মেঝের কার্পেটের ওপরই বসে পড়েছে। এখন তার মনোযোগ অমিত মুখার্জীর দিকে—‘আপনার কন্ঠস্বরটি কিন্তু চমৎকার অমিতবাবু। একদম আলাদা! স্পেশ্যাল, সুরেলা—গড্ গিফটেড্! যেমন গম্ভীর, তেমন গভীর! গান-টান গাওয়া হয় নাকি?’

নিতান্তই সাদা-মাটা প্রশ্ন। কিন্তু অর্নব সচকিত হয়ে ওঠে। কথাটা নেহাতই সরল। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত অর্থটি অত সহজ নয়। অমিতের গলা শুনলে মনে হয় কেউ হাঁড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে কথা বলছে! তার মনে পড়ে গেল ভয়েস কনভার্টারের কথা। এই স্পেশ্যাল, সুরেলা, ঈশ্বর প্রদত্ত কন্ঠস্বরকে বদলানোর জন্যই ভয়েস কনভার্টার ব্যবহৃত হয়নি তো!

বিপুলবাবু এতক্ষণে মুখ খুললেন—‘হ্যাঁ। গড গিফটেডই বটে! গডও উপরে বসে দুটো জিনিস দেখতে ও শুনতে পান। চীনের প্রাচীর ও অমিত মুখুজ্যের ডায়লগবাজি’।

বিপুলবাবুর কন্ঠস্বর শুনেও এই প্রথম চমকাল অর্নব। প্রথমবার ধরা ধরা নীচু স্বরে কথা বলছিলেন বলে বুঝতে পারেনি। এবার শুনে বুঝল ওঁরও কন্ঠস্বর এক্সট্রা অর্ডিনারি। আচমকা শুনলে মনে হয় একজোড়া ব্যাঙ ডাব্‌ল্ তানপুরা বাজিয়ে গলা সাধছে। এ গলা যে একবার শুনেছে তার আজীবন মনে থাকবে।

অমিত প্রতিবাদে কিছু বলতেই যাচ্ছিলেন। তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন ডঃ তেজেন বর্মন—‘ অমিতের আরেকটা স্পেশ্যালিটি আছে। আজ পর্যন্ত যত ছবি উঠেছে এই মজলিশের সেগুলোর একটাতেও ওর মুখ বন্ধ করা ছবি নেই। সব ছবিতেই হাঁ করে কী যেন বলতে যাচ্ছে!’

অধিরাজ হেসে ফেলল। অর্নবও মুচকি মুচকি হাসছে। ডঃ তেজেন বর্মন গোলগাল চেহারার সদাহাস্যময় মানুষ। দেখলেই মনে হয় ভারি রসিক। ভদ্রলোক বোধহয় খুব পান খান। এইমুহূর্তেও যেভাবে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছেন তাতে স্পষ্ট, মুখে একাধিক পান আছে। ঠোঁটদুটিও পানের রসে টুকটুকে। পানের রস গিলে ফের যোগ করলেন—‘অমিতের বন্ধ মুখের যে ছবি তুলতে পারবে তাকে আমি আমার রুপোর পানের বাটাটাও গিফ্‌ট করে দেব’।

অমিত সকলের খোঁচা খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে বললেন—‘এবার কি আমি কিছু বলতে পারি?’

পশুপতিবাবু বললেন—‘তাহলে এতক্ষণ কে বলছিল?’

সবাই সজোরে হেসে উঠলেন। এমনকি পরাশরবাবুর কোলে বসে পলও যেন মুচকি মুচকি হাসছে। পরাশরবাবুর আদরে তার ভারি আরাম হয়েছে। চোখ আরামে একেবারে বুঁজে এসেছে! আপাতত সে ভদ্রলোকের কোলে বসে ঝিমোচ্ছে!

‘তুমি হচ্ছ বিশ্বের একমাত্র স্বামী সম্ভবত যার কথার ঠ্যালায় গিন্নী পর্যন্ত চুপ করে থাকেন!’

‘আর আপনি?’ অমিত পালটা দিলেন—‘আপনার তো কথাই বলতে হয় না। এমনিই ভয়ের চোটে বৌদি চুপ করে থাকেন’।

পশুপতিবাবু মুখভঙ্গী করলেন। তার চোয়াল শক্ত হয়েছে। অর্থাৎ কথাটা পছন্দ হয়নি। তাকে এক লপ্তে জরিপ করে নিল অধিরাজ। দেখতে অত্যন্ত রাশভারি প্রকৃতির! অপ্রয়োজনীয় স্থূল ও চওড়া কাঠামোর চেহারা। কালো কুচকুচে রোমবহুল গা-হাত পা দেখলে প্রথমেই শিম্পাঞ্জির কথা মনে পড়ে। কপালটা অস্বাভাবিক উঁচু। চোখ

boierpathshala.blogspot.com

ভিতরে ঢোকানো ও কুৎকুতে। চোয়ালটা চারকোনা ও চওড়া, নিষ্ঠুর হনুর হাড় দেখলে ভয় লাগে। মনে হয়, যেমন হাশিখুশি লোকটাকে এখন দেখাচ্ছে, আদতে তেমন নয়! মাঝেমধ্যে সামান্য খুকখুক করে কাশছেন। ঠান্ডা গরমে কাশি হয়েছে হয়তো। বার কয়েক তার স্ত্রী এ ঘরে সবার অগোচরে উঁকি মেরে গেলেন। সম্ভবত দেখে গেলেন স্ন্যাক্স কিম্বা অন্যকিছু লাগবে কিনা। কিন্তু এ দেখে যাওয়া সুনিপুণ গৃহিনীর স্বতঃস্ফূর্ত তদারকি নয়। বরং খানিকটা যেন সন্ত্রস্ত ভৃত্যের জরিপ করে যাওয়া। হয়তো মনে ভয়, কিছু ফুরিয়ে গেলেই কর্তা তার মুন্ডুপাত করবেন।

'খাবার নিন্ না'। পশুপতিবাবু হেসে বললেন। হাসতেই তার সাদা দাঁতগুলো ঝলমল করে উঠল। সচরাচর খুব কালো মানুষদের খুব সাদা দাঁত থাকে। দেখা গেল এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি।

'আমরা অন-ডিউটি'। অধিরাজ সৌজন্যমূলক হেসে বলল—'আপনারা চালিয়ে যান। আমরাই বরং চলে যাচ্ছি...!'

'বাবা...!'

অধিরাজ কথাটা শেষ করার আগেই একটি দশ-বারো বছরের ছেলে ভিতরের ঘর থেকে পর্দা ঠেলে এই ঘরেই ঢুকল। অসম্ভব ভীত পায়ে, সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে সে। হাতে কী যেন একটা ধরা! সম্ভবত একটা প্যাকেট! প্যাকেটটা দেখেই অধিরাজ থম্‌কে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অর্নব শুনল সে বিড়বিড় করে বলছে—'ওর হাতে ওটা কী? পিৎজার প্যাকেট না?'

'রিকু!' পশুপতিবাবু গর্জন করে উঠলেন—'কতবার বলেছি পড়াশোনা ফেলে এ ঘরে আসবে না! আজকাল তুমি কথা না মানতে শিখেছ! কী করছ এ ঘরে তুমি? কালকের মার ভুলে গেছ?'

আশঙ্কায়, ভয়ে রিকু নামের বাচ্চাটি প্রায় নীল হয়ে যায়। অমিত মুখার্জী প্রতিবাদ করে উঠলেন—'এ কী পশুপতিবাবু! বাচ্চার সঙ্গে এ কীরকম ব্যবহার করছেন? বেচারিকে এরকম ভয় দেখানোর কোনও মানে হয়?'

'তুমি জানো না অমিত'। পশুপতিবাবুর বিনীত ভাব তিরোহিত! এখন তার মুখ খিঁচুনিটা পুরো শিম্পাঞ্জির মতই লাগছে! প্রায় হুঙ্কার দিয়ে বললেন—'আজকালকার ছেলে-মেয়েদের সিভিক সেন্স বলে কোনও বস্তুই নেই। বাবা-মায়ের কোনও কথা শোনে না!' তার সাদা সাদা দাঁতগুলো যেন কড়মড় করে উঠল—'এসব বাচ্চাদের বেতের ডগায় না রাখলে আদরে গোল্লায় যাবে'।

অর্নব অবশ্য সহমত হল না। এইমুহূর্তে সে ছেলের চেয়ে বাবাকেই বেতের ডগায় রাখতে চাইছিল! কিছু বাবা আছেন যারা সন্তানের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলাটাকেই তাদের মানুষ করা ভাবেন। নয়তো এই ভীত, শীর্ণ অথচ ভারি মিষ্টি বাচ্চাটিকে বেত মারার কথা কেউ ভাবতে পারে! মা একটা কথা প্রায়ই বলেন—'ঘরজ্বালানি, পরভুলানি'। এইমুহূর্তে পশুপতিবাবুকে তেমনই মনে হচ্ছিল তার।

'দাঁড়ান'। এবার অধিরাজ মাঠে নামল। পশুপতিবাবুর চেয়েও কড়া গলায় ধমক দিয়ে বলল সে—'ও কী বলতে চায় আগে দেখুন। তারপর তো বকবেন!'

ধমক খেয়ে পশুপতিবাবু একটু যেন হতভম্ব হয়ে গেলেন। সম্ভবত এভাবে কোনও ব্যারিটোন ভলিউমে জোরদার ধমক আগে কখনও খাননি ভদ্রলোক। তাও আবার প্রকাশ্যে! রীতিমত অপমানে বেগুনী হয়ে গিয়েছেন! তার মুখ বিকৃত হয়ে গেল।

'কী বলছিলে বাবা?' অধিরাজ এবার এগিয়ে গিয়েছে ছেলেটির দিকে—'কী হয়েছে বলো?'

'এইটা একটু আগে আমার ঘরে জানলার পাশের টেবিলে কে যেন রেখে গেছে আঙ্কেল'। রিকু ভয়ে ভয়ে বলল—'আর আমার ঘরের দেওয়ালে কীসব যেন লিখেও রেখেছে!'

boierpathshala.blogspot.com

সে বিস্মিত—'কী এটা?'

'পিৎজা!' বাচ্চাটা ভয়ে ভয়ে বাবার দিকে তাকায়—'আমি খাইনি। আর আমার ঘরের দেওয়ালে যেটা লেখা আছে, সেটাও আমি লিখিনি বাবা! আমি যখন টিউশনে গিয়েছিলাম, তখনই কে যেন এসে ...'।

শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে বলল অধিরাজ—'চলো তো দেখি, কী লেখা আছে'।

রিকুর ঘরে গিয়ে যে দৃশ্য দেখল ওরা তাতে সকলের চক্ষু চড়কগাছ। কে যেন জানলার পাশের সাদা দেওয়ালে ঠিক পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি বা পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি উচ্চতায় রঙ পেন্সিল দিয়ে লিখে রেখেছে—'হেট ইউ বাবা'।

অধিরাজ সভয়ে অস্ফুটে বলে—'কী সর্বনাশ! পশুপতিবাবু!'

'অসভ্য ছেলে!' পশুপতিবাবু ততক্ষণে ধেয়ে গিয়েছেন রিকুর দিকে। একটা পেল্লায় থাপ্পড় মেরে খেঁকিয়ে উঠলেন—'এসব শিক্ষা পাচ্ছ তুমি! এসব শিখছ...!'

কিন্তু আর একটিও শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেন না! এতক্ষণ খুশখুশে কাশছিলেন! এবার প্রবল কাশি এসে তার কণ্ঠরোধ করেছে। অর্নব সভয়ে দেখল হঠাৎ তার শরীরটা কেমন যেন শিথিল হয়ে গেল! তিনি নিজেকে সামলাতে চাইলেন, পারলেন না! নাক, মুখ দিয়ে টপ্ টপ্ করে রক্ত পড়ছে! বিকৃত মুখটা আরও বিকৃত হয়ে গেল! পড়েই যাচ্ছিলেন, তার আগেই তার দশাসই চেহারাটাকে ধরে ফেলেছে অধিরাজ।

'কী হল!' ডঃ তেজেন বর্মন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসেছেন। ঐ খন্ডমুহূর্তের মধ্যে যে কী হয়ে গেল কে জানে। গভীর আশঙ্কায় সকলে দেখল পশুপতিবাবুর নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে! মুখের কালচে ভাব ফ্যাকাশে হয়ে কেমন যেন নীলাভ রঙ ধরছে!

অধিরাজ অর্নবের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল—'অর্নব, কল দি অ্যাম্বুলেন্স!'

অর্নব তড়িঘড়ি ওঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। ডঃ তেজেন বর্মন পশুপতিবাবুকে পরীক্ষা করছেন। প্রাথমিক পরীক্ষা সেরে বললেন—'মনে হচ্ছে ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক। এখনই হস্‌পিটালাইজ্‌ড করতে হবে'।

পশুপতিবাবুর মুখের নীলচে ছোপের দিকে ইঙ্গিত করল অধিরাজ—'হার্ট অ্যাটাক? না ফুড পয়জনিং?'

বিপুল রায় ভয়ার্ত চোখে গোটা ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন। ভাঙা গলায় ফ্যাঁসফ্যাঁস করে বললেন—'ফুড পয়জনিং? তা কী করে হবে? উনি যা খেয়েছেন, আমরাও তাই খেয়েছি। এমনকি সিগারেটটাও একই প্যাকেট থেকে...!'

'কোলা!' পরাশরবাবুর কী যেন মনে পড়ে গেল। আস্তে আস্তে বললেন—'পশুপতিবাবুর ক্যাফেইনে অ্যালার্জি ছিল! ঐ কোলা থেকে কিছু হয়নি তো?'

'ওটা 'জিরো কোলা' পরাশরবাবু'। বিপুল রায় বললেন—'আমিও জানতাম ওঁর ক্যাফেইনে অ্যালার্জি আছে। তাই জিরো কোলা এনেছিলাম। জিরো কোলায় একফোঁটা ক্যাফেইনও থাকে না! তাছাড়া উনি তো স্রেফ তলানিটুকু খেয়েছিলেন। ঐটুকু ক্যাফেইন খেলেও ওর কিছু হত না!'

অমিত মুখার্জী লাফিয়ে উঠলেন—'আপনিই এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বিপুলবাবু। আমরা রোজ ফ্রুট জুস খেতাম, সেটাই ঠিক ছিল। কে বলেছিল আপনাকে কোলা আনতে? আজ যদি পশুপতিবাবুর কিছু হয়ে যায় তো তার জন্য আপনিই দায়ী থাকবেন'।

'চুপ করো অমিত'। বিপুল ফোঁস করে ওঠেন—'যা জানো না তা নিয়ে তর্ক কোর না। জিরো কোলায় ক্যাফেইন

boierpathshala.blogspot.com

থাকেই না! ওটা ক্যাফেইন ফ্রি ড্রিঙ্ক! তাছাড়া উনি চিরকালীন অভ্যাসমতই আমাদের সবাইকে সার্ভ করে শেষ তলানিটুকু খেয়েছিলেন মাত্র। কোলাটাতে ক্যাফেইনই ছিল না, তো ক্যাফেইনে অ্যালার্জি হবে কী করে?'

বলতে বলতেই সবাই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখল পশুপতিবাবুর কষ বেয়ে সাদা ফেনা গড়িয়ে পড়ছে। তিনি হয়তো কিছু একটা বলতে চাইছিলেন। কিন্তু একটা অস্ফুট গোঙানি ছাড়া আর কিছুই বেরোল না!

'পয়জনিং কেস হতেও পারে'। ডঃ তেজেন বর্মন চিন্তিত মুখে বললেন—'প্রাইমারি চেক্ আপের আগে কিছু বলা মুশকিল। এখনই হসপিটালাইজড করতে হবে'।

বলতে বলতেই বাইরে হুটারের আওয়াজ। অ্যাম্বুলেন্স এসে গিয়েছে।

'অর্নব, তুমিও ওঁদের সঙ্গে যাও'। পশুপতিবাবুকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিয়ে বলল অধিরাজ—'চতুর্দিকে কড়া নজর রাখবে। বিশেষ করে বিপুল রায় আর অমিত মুখার্জীর ওপরে। ওরা দুজনেই সঙ্গে যাচ্ছেন। হাসপাতালে গিয়ে যাতে কোনরকম তামাশা না করেন সেদিকে খেয়াল রেখো'।

'আর ডঃ তেজেন বর্মন?'

'সবার ওপরই খেয়াল রেখো। দেখো, যেন কেউ হস্‌পিটাল থেকেই ভেগে না যায়। প্রার্থনা করি পশুপতিবাবু সুস্থ হয়ে উঠুন। কিন্তু যদি তা না হয় তবে ফেয়ার চান্স আছে, এটা আমাদের অজানা বন্ধুরই কীর্তি! তেমন হলে তোমার সঙ্গের পুলিশবাহিনীকে সতর্ক করে দেবে'। অধিরাজ একটু ভেবে বলে—'উপর থেকে এটা হার্ট ফেইলিওর বা ফুড পয়জনিং মনে হলেও বোধহয় অত সহজ ব্যাপার নয়।'

বাধ্য ছাত্রের মতই ঘাড় নাড়ল অর্নব। ফিস্‌ফিস্ করে বলল—'তাহলে এটা খুন স্যার?'

'বাচ্চাটার ঘরের দেওয়ালে লেখাটা বা পিৎজাটা না থাকলে হয়তো এটা ন্যাচারাল হার্ট অ্যাটাক বা ফুড পয়জনিং বলেই মেনে নিতাম'। অধিরাজের কপালে ভাঁজ—'কিন্তু এটা খুন অর্নব। খুনী প্ল্যান করেই এসেছিল। এবার গোদা ভাবে খুন না করে, খুব সূক্ষ্ম ভাবে খুনের চেষ্টা করেছে'।

'কিন্তু চেষ্টা করল কখন?' অর্নব জানতে চায়—'কিভাবেই বা করল! ওরা ছ'জনই তো একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছেন। একই খাবার, একই পানীয় খেয়েছেন! তবে বিষটা এল কোথা থেকে? খাবারে বা পানীয়ে বিষ থাকলে তো সকলেই অসুস্থ হতেন।'

'সেটাও প্যারাডক্স অর্নব'। অধিরাজ দাঁতে দাঁত পিষল—'সেটা যদি বুঝতাম তবে কিছুই রহস্য থাকত না! লোকটা এবার আমাদের চোখের সামনে দিয়েই দিব্যি মার্ডার অ্যাটেম্‌ট্ করে বেরিয়ে গেল! তবে ওভারকনফিডেন্ট হলে যা হয়। একটা ভুল করে ফেলল!'

ভুল! সে বিস্মিত! গোটা প্ল্যানিঙে কোথাও একফোঁটা ভুল, সামান্য ছিদ্রও চোখে পড়ছে না অর্নবের। সে কিছু বলার আগেই অবশ্য উত্তরটা দিয়ে দিল অধিরাজ—'এটা গ্রাউন্ড ফ্লোর হলে অন্য কেউ রিকুর ঘরে জানলা দিয়ে পিৎজাটা রেখে দিতে পারত। কিংবা হাত বাড়িয়ে জানলার পাশে 'হেট ইউ বাবা' শব্দগুলো লেখাও খুব কষ্টসাধ্য নয়। কিন্তু চারতলায় সেটা অসম্ভব! সুতরাং যিনি খুনী, তিনি নির্ঘাৎ ঘরের ভেতর দিয়েই রিকুর ঘরে গিয়েছেন। এবং সেক্ষেত্রে ফুল চান্স, আমরা যাকে খুঁজছি তিনি পরাশরবাবু, কপিলবাবু, অমিত মুখার্জী, ডঃ তেজেন বর্মন ও বিপুল রায়ের মধ্যেই কোনও একজন! রিকুর ঘরে গ্রাফিটি লেখা, তার অনুপস্থিতিতে পিৎজা রেখে দেওয়া, এবং পশুপতিবাবুর খাবারে বা পানীয়ে বিষ মেশানোর চান্স শুধু ঐ পাঁচজনেরই ছিল। আর দেখার বিষয় যে এরা প্রত্যেকেই প্রায় পাঁচ ফুট নয় থেকে পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি মত লম্বা।'

অর্নবের গা শিরশির করে ওঠে! সে বুঝতে পারল কোন্ ভুলের কথা বলছেন স্যার! সন্দেহটা এতক্ষণ বিতস্তা

boierpathshala.blogspot.com

টাওয়ারের সব বাসিন্দাদের ওপরেই ছিল। এখন পাঁচজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েছে! এইমুহূর্তে পঁচিশ-ত্রিশ জন নয়, সাসপেক্ট মাত্র পাঁচজন!

'কিন্তু মোটিভ কী?'

অধিরাজ অন্যমনস্ক স্বরে বলল—'বোধহয় অল্প অল্প বুঝতে পারছি এখন। এখনও পর্যন্ত যে দুজন মারা গিয়েছেন তাদের মধ্যে একটাই মিল। তারা দুজনেই খুব খারাপ বাবা ছিলেন। প্রিয়মের বাবা'র কুখ্যাতি তো সবাই জানে। আর নিজের চোখেই দেখলে পশুপতিবাবু রিকুর সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করতেন! খুনী ঠিক তাদেরই টার্গেট করছে যারা খুব খারাপ পিতা কিংবা অত্যাচারী বাবা হিসাবে পরিচিত! এই জন্যই ঐ গ্রাফিটিটা 'হেট ইউ বাবা"।

'কিন্তু কেন?' অর্নব আকাশ পাতাল চিন্তা করে পায় না যে এই আচমকা পরোপকারের কারণ কী!

'উঁহু'। অধিরাজ মাথা নাড়ল—' সম্ভবত ব্যক্তিগত ফিলিংস! যে ব্যক্তি প্রত্যেকটা খুনের পর 'হেট ইউ বাবা' লিখছে, তার মন পড়ার চেষ্টা করো অর্নব। নিজেকে ওখানে রেখে ভাবো! খুনী আসলে প্রত্যেকটি অত্যাচারিত শিশুর মধ্যে নিজের ছায়া দেখছে! আর তার অত্যাচারী বাবা'র মধ্যে নিজের বাবাকে। তখন হয়তো ঘৃণার শোধ তুলতে পারেনি। তাই এখন এইভাবে তুলছে। কম্প্লিট কেস অব সাইকো কিলিং'।

সমস্তটা কেমন গুলিয়ে গেল অর্নবের। অধিরাজ বিড়বিড় করল—'এখন এই পাঁচজনের ব্যাকগ্রাউন্ড খতিয়ে দেখতে হবে। কোথাও একটা অত্যাচারিত রক্তাক্ত শৈশবের গল্প আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে...! কপিল মিশ্রর কথা আগে শুনেছি। কিন্তু উনি ছাড়া আর কেউ আছে কি?'

বলতে বলতেই ফের তার ব্লু টুথ সেট শব্দ করে উঠল। ওপ্রান্ত থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার বললেন—'স্যার, সার্চিং অপারেশন কী থামিয়ে দেব?'

'না'। সে দৃঢ় স্বরে বলল—'চালিয়ে যাও! আর পশুপতিবাবুর বাড়ি থেকে পিৎজার বক্স, খাবারের অবশিষ্টাংশ আর খালি কোলার বোতলটা অবশ্যই নিয়ে আসবে। ওগুলো এভিডেন্স!'

'ওকে স্যার'।

অর্নবকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিয়ে নিজের গাড়িতে ফিরে এল অধিরাজ! গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে বসতে যাবে, আচমকা চোখে পড়ল পাশের সিটে কী যেন পড়ে আছে। অবাক হয়ে গাড়ির ভিতরের লাইট জ্বালায় সে। কিন্তু যা দেখল তাতে তার বিস্ময়ের অবধি রইল না!

ড্রাইভারের ঠিক পাশের সিটটায় পড়ে আছে একটা কালো লেদার জ্যাকেট, আর কালো হেলমেট। অবিকল তেমনই, যেমন সিসিটিভির ফুটেজে খুনীর গায়ে দেখা গিয়েছিল। কোনও সন্দেহই নেই যে এটাই সেই হেলমেট ও জ্যাকেট, যার জন্য এতক্ষণ ধরে খানা তল্লাশি চলছে! সেটাই পড়ে আছে অধিরাজের গাড়িতে!

অধিরাজের মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। সে অস্ফুটে বলে—'চ্যালেঞ্জ? বেশ, নিলাম!'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়েই সে ফোন করল ঘন্টু খবরীকে। ঘন্টু বিতস্তা টাওয়ারসের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকে। এই অঞ্চলটাকে হাতের তালুর মত করে চেনে। যে কোনও খবরই বের করে আনা তার কাছে জলভাত।

'হ্যাঁ ঘন্টু?'

ও প্রান্ত থেকে চিম্‌সে নস্যি নেওয়া কন্ঠস্বর ভেসে এল—'অনেকদিন পর মনে করলেন সার। কী কেস? বিতস্তা টাওয়ারস নাকি?'

boierpathshala.blogspot.com

‘ধরেছিস ঠিকই’। অধিরাজ আলতো স্বরে বলে—‘কয়েকটা খবর দরকার’।

‘বলুন হুজুর। হয়ে যাবে’।

‘খোঁজ নে এই সোসাইটিতে ক’টা খড়ুশ বাপ আছে। আই মিন, ছেলে-মেয়েদের ধরে মারধোর করে এমন ক’জন বাবা আছে? আর পাঁচটা নাম পাঠাচ্ছি টেক্সট করে। সবক’জনের ব্যাকগ্রাউন্ড চাই আমার। অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিব্‌ল্‌। বুঝেছিস?’

কথা বলতে বলতে নিজের অজান্তেই অধিরাজের মুখ শক্ত হয়ে ওঠে

#পিৎজা (চতুর্থ কিস্তি)

৭.

‘ঝিঙ্গা লালা হু-উ-উ-উ! ঝিঙ্গা লালা হু-উ-উ-উ! হুর্‌র্‌র্‌ হুর্‌র্‌র্‌’।

ডঃ চ্যাটার্জী কপালে হাত দিয়ে বিষণ্ন মুখে টেবিলে বসেছিলেন। তার নতুন অ্যাসিস্ট্যান্ট আহেলি এক কাপ কফি এনে টেবিলে রাখল। নম্রস্বরে জানতে চাইল—‘আর কিছু চাই স্যার?’

তিনি কাঁচুমাচু মুখেই বললেন—‘ প্লিজ ওকে জিজ্ঞাসা করো যে থামতে কত নেবে?’

আহেলি বিস্মিত দৃষ্টিতে কাকাতুয়াটার দিকে তাকায়। কাকাতুয়াটা ফের গাইতে শুরু করেছে—‘ঝিঙ্গা লালা হু-উ-উ...’।

‘চো-ও-প!’ পাখিটার দিকে তর্জনী তুলে শাসালেন ডঃ চ্যাটার্জী—‘চুপ করবি কিনা বল্‌! নয়তো আজ লাঞ্চে কাকাতুয়াভাজা খাওয়া থেকে কোনও শালা আমায় আটকাতে পারবে না। যে তোকে এসব বুলি শেখাচ্ছে, তোর ফেভারিট মুখপোড়া লম্বুও না!’

কাকাতুয়াটা পিটপিট করে তার দিকে তাকিয়ে থেকে ফের দুলে দুলে গান জুড়ল—‘লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না/ চাই তার লাল ফিতে, চিরুনি আর আয়না/ জেদ বড় লাল পেড়ে টিয়ারঙ শাড়ি চাই/ মন ভরা রাগ নিয়ে হল মুখ ভারি তাই/ বাটা ভরা পান দেব, মান কেন যায় না...!’

‘শা-ট আ-প!’ ডঃ চ্যাটার্জী আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই অধিরাজের প্রবেশ ও অব্যর্থ মন্তব্য--

‘আবার আপনি ও বেচারির পেছনে লেগেছেন! বিষ তো দিতে চাইছে না! বাটা ভরা পান অফার করছে। তাতেও মান যাচ্ছে না!’

‘বাটা ভরা পান খেয়ে কাজ নেই আমার! বরং ঐ পান তুমি তোমার খুনীকে পেলে আমার তরফ থেকে দিয়ে দিও’। ডঃ চ্যাটার্জী গরগর করেন—‘শুনেছি সে নাকি পিৎজা কিনে একসঙ্গে একজোড়া পান খেয়েছিল! পানখোর ছাড়া কেউ অমন হাপুশ হুপুশ করে পান খায় না!’

অধিরাজ একমুহূর্তের জন্য যেন স্থির হয়ে যায়। তার চোখের দৃষ্টি নিষ্পলক। কয়েকমুহূর্ত স্তম্ভিতের মত ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—‘তাই তো! তাই তো!’

boierpathshala.blogspot.com

‘কী তাই তো?’ ডঃ চ্যাটার্জী ফের চটেছেন—‘এখন এসব দেয়ালা কোর না বাপু! এমনিতেই এই হতভাগাকে এনে আমার ঘাড়ে বসিয়েছ...!’

‘ঘাড়ে নয়, দাঁড়ে’। অধিরাজের মুখে আবার দুষ্টু হাসিটা ভেসে ওঠে—‘বলুন কী বলছিলেন। অটোপ্সি হয়ে গিয়েছে?’

‘কাল রাতে বসেই করেছি’। ডঃ চ্যাটার্জী বিরক্ত হয়ে বলেন—‘কোনওদিন তো আমার জন্য একটা আস্ত সিঙাড়া-পকোড়া আনতে দেখলাম না! কতগুলো সিঙাড়া, কচুরীর অবশিষ্টাংশ পাঠিয়েছ! কী করব ওগুলো নিয়ে! শুঁকবো!’

‘সে কি!’ সে চোখ কপালে তুলে বলে—‘অতবড় পিৎজাটা পাঠালাম সেটা কয়েকদিনেই ভুলে গেলেন!’

‘ভুলব কী করে?’ তিনি গম্ভীর মুখ করেছেন—‘তোমার পাঠানো জিনিস তো! পাঠাবার সময় কী কী অভিশাপ দিয়েছিলে কে জানে! খাওয়ার পরে তিনঘন্টা ধরে শুধু হেঁচকি আর চোঁয়া ঢেঁকুর তুলেছি’।

অধিরাজ কিছু বলতে গিয়েও হেসে ফেলল। মাথা চুলকে বলল—‘ঠিক আছে। যদি কাজের খবর দিতে পারেন তবে আজ লাঞ্চে আপনাকে আস্ত চিকেন তন্দুর খাওয়াবো। এখন কাজের কথায় আসি?’

নাঃ, শেষপর্যন্ত পশুপতিবাবুকে বাঁচানো যায়নি। তিনি হাসপাতালে যাওয়া মাত্রই তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়! অ্যাম্বুলেন্সেই মারা গিয়েছিলেন ভদ্রলোক। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার! কোনও বিষ তার স্টমাকে পাওয়া যায়নি। বরং মৃত্যুর কারণ অতিরিক্ত মাত্রায় ক্যাফেইন সেবন। প্রায় ৫০০ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন পাওয়া গিয়েছে তার শরীরে। কিন্তু এত ক্যাফেইন তার দেহে এল কী করে সেটাই আপাতত বড় প্রশ্ন! তিনি চা, কফি খেতেন না। এমনকি কোল্ড ড্রিঙ্কও না! মেডিক্যাল হিস্ট্রি বলছে ভদ্রলোকের ক্যাফেইনে মারাত্মক অ্যালার্জি ছিল! অল্পস্বল্প ক্যাফেইনে হয়তো তেমন বিশেষ কিছু হত না! কিন্তু যেখানে একজন স্বাভাবিক মানুষ দিনে ৪০০মিলিগ্রামের বেশি ক্যাফেইন গ্রহন করলেই অসুস্থ হয়ে পড়ে, সেখানে একজন অ্যালার্জেটিক মানুষ ৫০০ মিলিগ্রামে তো নিশ্চিত মরবেই! খুনী কোনওরকম দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের জায়গাই রাখেনি!

অন্যদিকে সে রাতে যে কোলাটি ওরা সবাই মিলে খেয়েছিলেন সেটি ‘জিরো’ কোলা। সদ্যই ভারতে এসেছে। সম্পূর্ণ ক্যাফেইন ফ্রি কোলা! তার ওপর পশুপতিবাবু নিতান্তই সামান্য খেয়েছিলেন। তার অভ্যেস ছিল, সবার খাওয়া হয়ে যাওয়ার পরে তিনি যে কোনও পানীয়ের শেষটুকু চুমুক দিয়ে পান করতেন। সম্ভবত উদ্যোক্তা হওয়ার ভদ্রতাতেই এই অভ্যেস। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে দুই লিটারের বোতলের অবশিষ্টাংশ প্রায় তিনশো মিলিলিটার কোলা তিনি খেয়েছিলেন—তাতেও এই অবস্থা হওয়া উচিত নয়। তবে?

‘প্রথমত, স্ন্যাক্সে কোনও রকম বিষ নেই’। জিরো কোলার বোতলটা তুলে নিয়ে বললেন ডঃ চ্যাটার্জী—‘ দ্বিতীয়ত, এটা জিরো কোলার বোতলই বটে। এবং জিরো কোলা একদম ক্যাফেইন ফ্রি! তোমার কথা শোনার পর আমি বাজার থেকে একটা জিরো কোলার স্যাম্পেল আনিয়ে টেস্ট করিয়েছি। বিপুলবাবু সত্যি কথাই বলছেন। জিরো কোলায় একফোঁটা ক্যাফেইনও নেই!’

‘তবে?’ সে অবাক—‘অত ক্যাফেইন লোকটার শরীরে কোথা থেকে এল?’

‘এল এই কারণে যে বোতলটা জিরো কোলার ছিল ঠিকই, কিন্তু ওর ভিতরে জিরো কোলা ছিল না’। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ গ্লাভস পরতে পরতে বললেন—‘যে কোলাটা ছিল, সেটার তলানি এখনও একচিলতে পড়ে আছে। কম্পোজিশন মিলিয়ে দেখে বলে দিতে পারি, এটা জিরো কোলা নয় বরং একটা জোরালো এনার্জি ড্রিঙ্ক ‘এনার্জি ফ্রেঞ্জি’ নামের একটা কোলা। সাধারণ কোলায় ক্যাফেইন থাকলেও খুব কম মাত্রায় থাকে। দশ মিলিলিটারে পয়েন্ট এইট থেকে বড়জোর ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিগ্রাম। মানে খুব বেশি হলেও একটা দু লিটারের বোতলে

boierpathshala.blogspot.com

কোনভাবেই দুশো চল্লিশ মিলিগ্রামের বেশি নয়। সেক্ষেত্রে যদি পশুপতিবাবু তিনশো মিলিলিটারও কোলা খেতেন তবে বড়জোর ছত্রিশ মিলিগ্রাম ক্যাফেইন কনজিউম করতেন—যেটা একেবারেই ফেটাল নয়!'

'কিন্তু এখানে তো ভয়ঙ্কর ফেটাল হয়ে গেল!' অধিরাজ কৌতুহলী—'সেটা কীকরে হল?'

'আসছি...আসছি...'। ডঃ চ্যাটার্জী বললেন—'এনার্জি ফ্রেঞ্জি এই মুহূর্তে বাজারের সবচেয়ে বেশি ক্যাফেইন ওয়ালা কোলা। প্রতি দশ মিলিলিটারে প্রায় আড়াই মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে। যার জন্য বড় বোতলে পাওয়া যায় না। এনার্জি ফ্রেঞ্জির মালিক পক্ষ রীতিমত হিসাব কষেই একে বাজারে ছেড়েছে। এটা কোনও বোতলে থাকে না। বরং ক্যানে থাকে। পাঁচশো এম এলের বোতলেই তুমি পাবে না, তো দু লিটারের বোতল তো কোন দূর!'

'আপনি বলতে চাইছেন যে খুনী এনার্জি ফ্রেঞ্জির ক্যান কিনে জিরো কোলার গোটা দু লিটারের বোতল ভরেছে, এবং সুযোগমত বিপুলবাবুর জিরো কোলার বোতলের সঙ্গে পালটে দিয়েছে '। অধিরাজ একটু থেমে বললেন—'তার জন্য নিশ্চয়ই অনেকগুলো ক্যান লেগেছে!'

'একদম'। ডক্টর মাথা ঝাঁকালেন—'এবং লিখে রাখো, একজন দোকানদারের কাছ থেকে সবগুলো ক্যান সে কেনেনি। কারণ এনার্জি ফ্রেঞ্জি তুমি কোনও রিটেলারের কাছ থেকে দুটোর বেশি পাবে না। এই কোলা দুটোর বেশি দেওয়া নিষিদ্ধ। সবজায়গায় তুমি পাবেও না। অতএব আমি অবাক হব না যদি খুনী গোটা শহর চষে এতগুলো কোলার ক্যান কিনে থাকে'।

'কিন্তু তাতেও একটা রহস্য স্পষ্ট হল না ডক্'। তার ভুরুতে ভাঁজ –'এনার্জি ফ্রেঞ্জি যদি খেয়েও থাকেন পশুপতিবাবু, তবু খুব অল্পই খেয়েছিলেন। বড়জোর তিনশো এম এল। যদি এনার্জি ফ্রেঞ্জিতে আড়াই মিলিগ্রাম পার দশ মিলিলিটার ক্যাফেইনও থাকে, তবু তাঁর বড়জোর পঁচাত্তর মিলিগ্রাম ক্যাফেইন কনজিউম করার কথা। সেক্ষেত্রে হয়তো সামান্য অসুস্থ হতেন। কিন্তু একদম মারা যেতেন না! অথচ ডাক্তাররা বলছেন, উনি প্রায় পাঁচশো মিলিগ্রাম ক্যাফেইন কনজিউম করেছিলেন!'

'ঠিক'।

'অথচ মজলিশে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন যে পশুপতিবাবু শুধু কোল্ড ড্রিঙ্কসের শেষটুকু খেয়েছিলেন! তবে কী তারা মিথ্যে বলছেন?'

এবার অদ্ভুত একটা হেঁ হেঁ হাসি হেসে টাকে আয়েশ করে হাত বোলাতে শুরু করেছেন ডঃ চ্যাটার্জী। টাকটাকে অনেক আদর টাদর করে বললেন—'না, তাঁরাও সত্যিই বলছেন। এই রহস্যটা শুধু ডঃ অসীম চ্যাটার্জীই ভেদ করতে পারে! ত্রিভুবনে আর কেউ এই তথ্যটা তোমায় দিতে পারবে না!'

অধিরাজ বিড়বিড় করে—'তাহলে দিয়েই দিন না! খামোখা ফুটেজ খাওয়ার কারণ কী?'

'কী?'

'কিছু না?' সে সামলে নেয়—'আগে?'

'আমি ভিকটিমের পেটে খুব অল্প হলেও ক্লোরোফর্ম পেয়েছি। এবং তার থেকেই বুঝলাম যে তোমার খুনী খুব রহস্য রোমাঞ্চ পড়ে। অন্তত আগাথা ক্রিস্টি তো পড়েই!'

'মানে!' অধিরাজ মুখ লম্বা করল—'তাতে কী?'

'দ্য মিস্টিরিয়াস অ্যাফেয়ার অ্যাট স্টাইলস্ মনে আছে? সেখানে এক ভদ্রমহিলা ওষুধের শেষ দাগটা খেয়ে মারা গিয়েছিলেন? ওষুধের গোটা বোতলের স্ট্রিকনিন্ শেষ দাগটায় জমা হয়েছিল!' তিনি রহস্যময় হাসি

boierpathshala.blogspot.com

হাসছেন—'এখানেও সেই একই কেস! খুনী জানত যে পশুপতিবাবু সবসময়ই ড্রিঙ্কসের তলানিটা খেয়ে থাকেন। তাই সে এমন ব্যবস্থা করেছিল যাতে বোতলের তলানিতেই মোট দু লিটারের বোতলের সমস্ত ক্যাফেইন জমা হয়। একেই এনার্জি ড্রিঙ্কে দশ মিলিলিটার প্রতি আড়াই মিলিগ্রাম ক্যাফেইন থাকে। তবে দু লিটারে থাকবে প্রায় পাঁচশো মিলিগ্রাম। সে সেই পুরো পাঁচশো মিলিগ্রাম ক্যাফেইনই বোতলের তলায় জমা করেছিল!'

'সে কী!' অধিরাজের চক্ষু চড়কগাছ—'বলেন কী? কী করে?'

'হুঁ হুঁ বাবা! ফরেনসিক জিনিসটাকে তোমরা পাত্তা দিতে চাও না!' তিনি সর্বজ্ঞের মত বললেন—'অথচ আমি না থাকলে তুমি চোখে সর্ষেফুল দেখতে! কৃতজ্ঞতাবশত একটা সেফটিপিনও দিলে না কোনওদিন! আমারই ফাটা কপাল! যাই হোক্, দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক কীভাবে খুনী কাজটা করেছে।'

তিনি একটা বীকারে কোলা ভরে সেটাকে টেনে আনলেন। তারপর একটা মাস্ক এগিয়ে দিয়ে বললেন—'এটা পড়ে নাও। নয়তো পতন ও মূর্ছা হতে পারে!'

অধিরাজ বিনাবাক্যব্যয়ে মাস্কটা পড়ে নেয়। ডঃ চ্যাটার্জী বললেন—'এইবার আমরা কোলায় খুব অল্প ক্লোরোফর্ম অ্যাড করব। এতখানি নয় যাতে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়। ক্লোরোফর্মের মাত্রা কম না থাকলে যাঁরা ঐ বোতল থেকে ড্রিঙ্ক নিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই হয় অজ্ঞান হয়ে পড়তেন, নয়তো ঝিমোতেন। আগেই সন্দেহ হত। তাই ক্লোরোফর্ম এমনভাবে মিক্স করা হয়েছে যাতে শুধুমাত্র সেটা ক্যাফেইনটাকেই আলাদা করে। আর কোনও ক্ষতি যাতে না হয়'।

'কোনওরকম সাইড এফেক্ট থাকবে না ক্লোরোফর্মের?'

'কম মাত্রায় মেশালে থাকবে না'। তিনি কয়েক ফোঁটা ক্লোরোফর্ম অতি সাবধানে কোলার বীকারে ফেললেন—'বড়জোর রাতে ঘুমটা খুব ভালো হবে। আর এখন যা জমানা পড়েছে তাতে প্রায় সব মানুষই স্ট্রেস ফ্রি বা সেডেটিভ নেয় রাতে। দীর্ঘদিন ঘুমের ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস থাকলে ক্লোরোফর্মও ফেল মারবে। যাই হোক্--এবার দেখ'।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা। তারপর দেখা গেল বীকারের তলানিতে ঘন একটা কিছু জমা হয়েছে।

'দেখেছ?' ডঃ চ্যাটার্জী বললেন—'এই হল ক্যাফেইন। একদম তলানিতে জমা হয়ে আছে। এই মুহূর্তে সমস্ত কোলার ক্যাফেইন ঐ তলানিটুকুতেই পড়ে রয়েছে। সেদিনও ঘটনাটা এমনই হয়েছিল। তিনশো মিলিলিটারের ক্যাফেইন নয়, পুরো দু লিটারের ক্যাফেইন খেয়েছিলেন ভদ্রলোক। প্রায় পাঁচশো মিলিগ্রাম'।

'কিন্তু এখন যদি কেউ এই দ্রবণটাকে ঝাঁকায়?'

'ইন দ্যাট কেস ক্যাফেইনটা আবার কিছুটা মিশে যাবে'। তিনি বলেন—'কিন্তু কোলা কেউ ঝাঁকিয়ে খাবে কেন! কাশির ওষুধ পেয়েছ নাকি যে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে খাবে!'

'ভাবা যায় না!' অধিরাজ বলল—'ডক্, ক্যান আই ম্যারি ইওর ব্রেন?'

ডঃ চ্যাটার্জী গরগর করে উঠলেন। অধিরাজ পাত্তা দিল না। সে তখন ভাবছিল, কী চতুর খুনী! পশুপতিবাবুর মৃত্যুটা আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক বা অ্যাক্সিডেন্ট মনে হত যদি পিৎজা আর 'হেট ইউ বাবা'র গ্রাফিটিটা না থাকত! চতুর্দিকে পুলিশ বেষ্টনী। চরম নিরাপত্তার মধ্য দিয়েও সে আরেকটা খুন করে বেরিয়ে গেল। শুধু খুন নয়, তার সঙ্গে জানানও দিয়ে গেল যে 'খুনটা আমিই করেছি—কী করবি কর্'! কী ভাবে কী করবে, কী ভাবে থামাবে লোকটাকে—বুঝেই উঠতে পারছে না!

'তবে তোমার সন্দেহই ঠিক। ঐ পাঁচজনের মধ্যেই কেউ খুনী'। কাজ শেষ করে হাতের গ্লাভস খুলছেন ডঃ

boierpathshala.blogspot.com

চ্যাটার্জী। গায়ের অ্যাপ্রনটাকে হ্যাঙারে ঝুলিয়ে বললেন—'কারণ পশুপতিবাবু যে সবসময় লাস্ট সিপ্‌টাই নিতেন, তা একমাত্র ওদের পক্ষেই জানা সম্ভব!'

'হুম্'।

'আচ্ছা রাজা...!' আস্তে আস্তে বলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ—'এটা যে সাইকো কিলিং, তা বুঝলে কী করে? সাইকো কিলারের ছদ্মবেশে অন্য কেউ কাজটা করছে না তো? অনেক সময় দেখা গিয়েছে যে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট একজনকে মারার জন্যই বাকি খুনগুলো করা হচ্ছে! পুলিশকে দিক্‌ভ্রান্ত করার জন্য কেউ সাইকো-কিলারের ক্যামোফ্লেজ নেয়নি তো?'

'আমারও প্রথমে তেমনই সন্দেহ হয়েছিল ডক্'। অধিরাজ ক্লান্ত ভাবে বলে—'কিন্তু একটা লিড আচমকা এমনভাবে এল যাতে এখন মনে হচ্ছে এটা ক্লিয়ার কেস অব সাইকো কিলিং'।

'এমন মনে হওয়ার কারণ?'

'পিৎজার দোকানি বলেছিল লোকটা চেঞ্জ নেয়নি। পানের দোকানিকে তো আবার দু-বার পয়সা দিয়েছে। সেখানেও চেঞ্জ নিতে ভুলে গিয়েছে'। সে আস্তে আস্তে বলল—'এ তার নিছক টাকা ছড়ানো নয়। লোকটার ভুলে যাওয়ার সমস্যা আছে। যখনই টেনশনে থাকে, তখনই কিছু না কিছু ভুলে যায়। খুব ভয়ঙ্কর অ্যামনেশিয়া নয়! কিন্তু বহুবছর ধরে যদি কেউ মানসিক সমস্যায়, বা ডিপ্রেশনে ভোগে, এবং সাইকিয়াট্রিক ড্রাগস্ নেয়, তবে তার এই জাতীয় ভুলে যাওয়ার রোগ হয়। ওর ভুলে যাওয়ার রোগ, বারবার 'হেট ইউ বাবা' লেখা, হত্যার পেছনে একটা খারাপ শৈশবের থাকার সম্ভাবনা, অত্যাচারী বাবাদের প্রতি চরম ঘৃণা, পাশাপাশি বাচ্চাদের প্রতি সহানুভূতি, পিৎজা দেওয়া—এসবই প্রমাণ করে আমাদের মক্কেল ঠিক মানসিকভাবে সুস্থ লোক নয়। অবধারিত ভাবেই তিনি কোনও সাইকিয়াট্রিক ড্রাগ নেন। অতএব মনে হচ্ছে এটা সাইকো কিলিংই!'

'হতে পারে'। ডঃ চ্যাটার্জী বললেন—'তবে সেই সঙ্গে আরেকটা পয়েন্ট যোগ করে নাও। তোমার খুনী ঘোড়ার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত!'

'আবার ঘোড়া!'

'একদম'। তিনি হেলমেটটা তুলে নিয়েছেন—'এই হেলমেটটা কার খুঁজে পেয়েছ?'

'নাঃ! বিতস্তা টাওয়ারসের কোনও লোকের নয় এইটুকু বুঝেছি। কেউই এই হেলমেটটি শনাক্ত করতে পারেননি'।

'স্বাভাবিক। কারণ এটা একদম ব্র্যান্ড নিউ হেলমেট!' ডঃ চ্যাটার্জী বললেন—'এর স্পঞ্জের পোর্শনটা দেখ। একদম ঝকঝকে। স্ট্রেসও বিশেষ পড়েনি। এর মধ্যে আমি আবার একটা ঘোড়ার লেজের চুল পেয়েছি। এ খুনী নির্ঘাৎ ঘোড়া পোষে'।

'আবার ঘোড়া! ওকে ডক্'। অধিরাজ মুচকি হাসে—'ইউ আর জিনিয়াস। আরেকটা প্রশ্ন'।

'তোমার প্রশ্ন তো ভারত সরকারের কোশ্চেনেয়ার দেখছি'। তিনি খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন—'শেষই হতে চাইছে না! বলো কী বলবে'।

'আচ্ছা, ধরুন এই কাকাতুয়াটা যদি বাই এনি চান্স কিলারকে দেখে থাকে, এবং দ্বিতীয়বার তাকে খুনীর সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়, তবে কি সে রি-অ্যাক্ট করবে?' অধিরাজ শ্বাস টানল—'প্রিয়ম্ বলেছিল যে খুনী মাথার হেলমেট খুলেছিল। কিন্তু ও পেছন থেকে তার মুখ দেখতে পায়নি। ইন কেস্ যদি কাকাতুয়াটা দেখতে পায়, তবে কি সে কোনরকম ইশারা করতে পারে?'

boierpathshala.blogspot.com

‘পারে’। ডঃ চ্যাটার্জীর চটজলদি জবাব—‘কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না—যে কোনও পাখিই বল, তাদের বুদ্ধি একটা পাঁচ বছরের বাচ্চা ছেলের সমান হয়। আই কিউ লেভেলও তেমনই। কাকাতুয়াটা যদি খুনীকে দেখে থাকে সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার তার মুখোমুখি হলে ভয় পাবে। ডানা ঝাপ্টে পালাতে চাইতে পারে। কিছু না কিছু রি-অ্যাকশন তো হবেই’।

‘থ্যাঙ্কস ডক্’। বলেই সে দাঁড়শুদ্ধ কাকাতুয়াটাকে তুলে নিয়েছে—‘এটা এবার ইন্টারোগেশনে কাজ দেবে। প্রাইমারি সাসপেক্টদের কাল এটার সামনে বসিয়ে জেরা করব। তারপর দেখব কী হয়!’

‘গুড থিঙ্কিং। আপদ যে বিদেয় হচ্ছে তাতে আমি খুশি। লাঞ্চে না হয় চিকেন তন্দুর তোমাকে আমিই খাওয়াবো। কিন্তু জানো তো...’ তিনি বললেন—‘কাকাতুয়ার সাক্ষ্য কিন্তু কোর্টে বাতিল হবে। আর অনারেব্‌ল্ জাস্টিসকে যদি ‘চুপ কর্ টাকলু’ বলে ধমক টমকও দিয়ে দেয়, তবে খুনী তো পরে, আগে তোমার বিরুদ্ধেই কেস চলবে’।

‘কাকাতুয়ার সাক্ষ্য কোর্টে চলবে না ঠিকই। কিন্তু অন্তত বুঝতে পারব যে এসবের পেছনে কে আছে! তারপর প্রমাণ জোগাড় করার দায়িত্ব আমার’। অধিরাজের কপালে ভাঁজ পড়ে—‘ এইটুকু তো ক্লিয়ার হোক্ যে প্রিয়ম্ এটার দিকে আঙুল তুলে কী বলছিল?’

কাকাতুয়াটা ড্যাব্‌ড্যাব্ করে কিছুক্ষণ অধিরাজের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর কড়কড়ে গলায় বলে ওঠে—‘চুপ্ কর্ মুখপোড়া লম্বু। তোকে ভেজে খাব’।

সে কাকাতুয়াটার কথা শুনে হেসে ফেলল। ডঃ চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে বলে—‘গুড ওয়ান ডক্। আচ্ছা, শোধবোধ’।

‘স্যার...!’

নিজের কেবিনে ফিরতে না ফিরতেই অর্নব দ্রুত পায়ে একতাড়া কাগজ নিয়ে অধিরাজের কাছে এসে উপস্থিত। দাঁড়শুদ্ধ কাকাতুয়াটাকে দেখে তার চোখে কৌতুহল ছায়া ফেলে সরে গেল মুহূর্তে —‘আপনি বলেছিলেন এরকম ঘটনা আগে কোথাও ঘটেছিল কি না! এই দেখুন বাঁশদ্রোণী থানা থেকে রিপোর্ট এসেছে। এরকম একবার নয়, দুবার ঘটেছে। তাও পাশাপাশি বাড়িতে!’

‘এই আশঙ্কাই ছিল’। সে হাত বাড়িয়ে দেয়—‘দেখি’।

বাঁশদ্রোনী পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী এই সাইকো কিলিং এর ঘটনা এর আগেও দুবার ঘটেছে। তিনবছর আগে বাঁশদ্রোণীর বাসিন্দা রজত গাঙ্গুলি ও তাঁর প্রতিবেশী পরিতোষ দত্ত’র মৃত্যুও অবিকল এভাবেই ঘটে। রজত গাঙ্গুলির স্ত্রী’র স্টেটমেন্ট অনুযায়ী, ভদ্রলোক অত্যন্ত বদমেজাজী ছিলেন। স্ত্রী-পুত্রের কোনও কাজই পছন্দ হত না। কথায় কথায় গায়ে হাত তুলতেন। মাতাল না হলেও দুশ্চরিত্র ছিলেন। বেশিরভাগ দিনই অফিসের সুন্দরী সেক্রেটারির কাছেই থাকতেন। তাই যখন পরপর তিনদিন তিনি বাড়ি ফিরলেন না, মিসেস গাঙ্গুলি খুব একটা বিচলিত হননি। কারণ এরকম ঘটনা তার ক্ষেত্রে অন্তত নতুন ঘটছিল না। রজত গাঙ্গুলি বেশিরভাগ সময়ই সেক্রেটারিকে নিয়ে দার্জিলিঙ বা দীঘা বেড়াতে চলে যেতেন। তাই তার নিখোঁজ হওয়া নিয়ে বেশি মাথা ঘামাননি।

কিন্তু অবশেষে একদিন খুব ভোরে কলিংবেল বেজে উঠল। ভদ্রমহিলা বাইরে বেরিয়ে এসে দেখেন, বারান্দায় তার স্বামীর নিষ্প্রাণ, রক্তাক্ত শরীর পড়ে আছে। পাশে পিৎজার বাক্স। দেওয়ালে যথারীতি লেখা ‘হেট ইউ বাবা’।

এর ঠিক দু সপ্তাহ পরেই পাশের বাড়ির পরিতোষ দত্ত খুন হলেন। তার দুই ছেলে এক মেয়ে। কন্যাসন্তানটিকে মারধোর না করলেও অবহেলা করতেন। হয়তো মেয়ে সন্তান তিনি চাননি। অথবা ঐ মেয়েটিকে জন্ম দিতে

boierpathshala.blogspot.com

গিয়েই তার স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন বলে মেয়েটিকে মনে মনে ঘৃণা করতেন। তাই মা মরা মেয়েটি কখনই বাবার স্নেহ, সহানুভূতি পায়নি। মেয়েটিকে সবসময় শাপশাপান্ত করে একরকমের মেন্টাল টর্চার করতেন। আত্মীয়, পরিজন, প্রতিবেশীরা অনেকেই বুঝিয়েছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। সেই পরিতোষ দত্তকে কে যেন একরাতে চপার দিয়ে কুপিয়ে গেল! এখানেও মৃতদেহের সঙ্গে পিৎজার বাক্স এবং সেই একই গ্রাফিটি। 'হেট ইউ বাবা'।

'আই নিউ ইট!' অধিরাজ টেবিলে চাপড় মারে—'আমি জানতাম এরকম ঘটনার নজির নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। এখন বলো, এই ঘটনার সঙ্গে বিতস্তা টাওয়ারের কোনও মক্কেলের লিঙ্ক পাচ্ছ?'

'প্রয়োজনের বেশি লিঙ্ক আছে স্যার'। অর্নব সপ্রতিভভাবে বলে—'প্রথমত রজত গাঙ্গুলি ও পরাশরবাবু একই অফিসে চাকরি করতেন। রজত পরাশরবাবুর বস্ ছিলেন। দ্বিতীয়ত, পরিতোষ দত্ত ও রজত গাঙ্গুলির বাচ্চারা যে স্কুলে পড়ে, বিপুল রায় ও অমিত মুখার্জী সেই স্কুলেই পড়ান। ইনফ্যাক্ট রজত গাঙ্গুলি ও পরিতোষ দত্তের বিরুদ্ধে সন্তানের উপর অত্যাচারের আরোপ প্রথম আনেন অমিত মুখার্জী। উনি ওদের ক্লাস টিচার ছিলেন। বাচ্চাদের অস্বাভাবিক হাবভাব, গায়ে, হাত-পায়ে মারের দাগ প্রথম তিনিই নোটিস করেন। রজত গাঙ্গুলি ও পরিতোষ দত্তকে ডেকেও পাঠান। কিন্তু ফল কিছু হয়নি'।

'ঐ একই স্কুলে কপিল মিশ্র ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ করেন না?'

'হ্যাঁ স্যার'। অর্নব মাথা ঝাঁকায়—'শুধু তাই নয়, ডঃ তেজেন বর্মন ওদের ফ্যামিলি ডক্টর ছিলেন। ডঃ তেজেন বর্মন তিনবছর আগেও ঐ একই কলোনীর বাসিন্দা ছিলেন। এরপর উনি পাকাপাকি ভাবে বিতস্তা টাওয়ারসে চলে আসেন!'

'তার মানে আমাদের পাঁচজন মক্কেলই কোনও না কোনও ভাবে ঐ দুটো খুনের সঙ্গে যুক্ত'।

তার চটজলদি জবাব—'হ্যাঁ স্যার। এবং এই যোগাযোগ কাকতালীয় মনে হয় না। ভিতরে কোনও গোলমাল আছে। যদিও পুলিশ এই খুনগুলোর কোনও কুল-কিনারা করতে না পেরে শেষে ব্লাইন্ড কেস বলে ফাইল বন্ধ করে দেয়'।

'গোলমাল তো আছেই'। অধিরাজ অনেকক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরায়—'হয় এদের মধ্যে কেউ একজন খুনী। নয়তো পাঁচজনই'।

'পাঁচজনই!'

'অসম্ভব নয়!' সে কিছুক্ষণ ভাবল—'একটা কাজ করো অর্নব, সমস্ত পিৎজা কর্নারে ফোন করে খবর নাও, কোনও অদ্ভুতদর্শন সন্দেহজনক ব্যক্তি, সম্ভবত মুখঢাকা বা হেলমেটপরা মানুষ কোনও পার্লার থেকে প্যান পিৎজা উইথ মোজারেলা টপিংস কিনছে কিনা। দরকার পড়লে প্রত্যেকটা পিৎজা পার্লারে সাদা পোষাকের পুলিশের পাহারা বসিয়ে দাও। আমি তৃতীয় খুনটা চাই না'।

'আপনার মনে হয় যে লোকটা আবার একটা খুন করবে?'

'চান্স...চান্স অর্নব!' সে অন্যমনস্ক হয়ে বলে—'চান্স নিচ্ছি। এখনও অন্তত একজন অত্যাচারী বাবা ওখানে আছেন। কপিল মিশ্র'র আর্মি অফিসার বাবা! কপিল যদিও ছোট বাচ্চা নয়। তবু চান্সটা নিতেই হবে। যে লোক অত্যাচারিত সন্তানদের উদ্ধার করার ব্রত নিয়েছে, সে কী অত সহজে কপিল মিশ্র'র লম্পট বাবাকে ছাড়বে? মনে হয় না!'

কথা বলতে বলতেই সে অর্নবের দিকে তাকিয়েছে—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আবার খুন হবে। এবং খুব শীগ্‌গিরিই।

boierpathshala.blogspot.com

তুমি পিৎজা কর্নারের সবক'টা শাখায় বলে রাখো, কেউ প্যান পিৎজা উইথ মোজারেলা চিজ টপিংস কিনলেই যেন সবার আগে আমাদের হট লাইনে খবরটা দেয়। আর সাদা পোষাকের পুলিশ নামিয়ে দাও প্রতিটা পার্লারের সামনে। প্রতিটা আপডেট চাই আমার। কোনও চান্স নেব না এবার'।

'ওকে স্যার...' চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল অর্নব—'ঘন্টু খবরি অনেকক্ষণ আপনার অপেক্ষায় বাইরে বসে আছে। ভিতরে আসতে বলবো?'

'হ্যাঁ'। অধিরাজ রিভলভিং চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলে—'ভিতরে পাঠিয়ে দাও। দেখি, জরুরি কোনও খবর দিতে পারে কি না!'

'ইয়েস স্যার!'

সে রিভলভিং চেয়ারে দোল খেতে খেতে ধীরে সুস্থে সিগারেটটাকে শেষ করল। তারপর ঠান্ডা জলের গ্লাসটাকে এক চুমুকে খালি করে দিল। ইতিমধ্যেই কেবিনের দরজাটা খুলে গিয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে ঘন্টু খবরির নারকেলের মত মুন্ডু।

'আসব?'

'আয়'। অধিরাজের ভুরু সকৌতুকে নেচে উঠল—'খবর কিছু পেলি?'

'পেয়েছি সার'। ঘন্টু স্মার্টলি জবাব দেয়—'একদম সলিড খবর। আপনি জানতে চাইছিলেন না ও সোসাইটিতে ক'টা খড়ুশ বাপ আছে?'

'আমি কী জানতে চেয়েছি সেটা বড় কথা নয়'। অধিরাজ এসিটা অন্ করে দিয়ে বলে—'তুই কী খবর এনেছিস সেটাই ইম্পর্ট্যান্ট'।

'জব্বর খবর সার! যাকে বলে হাতে গরম! আই ব্বাপ সার! আপনি ইন্ডিয়া কিংস খান! এ তো পুরো মাখন!'

ঘন্টু সিগারেটের প্যাকেটটার দিকে জুলজুলে দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে দেখে সে গোটা প্যাকেটটাই ওর হাতে ধরিয়ে দেয় --'নে। মাখনও মেরে দিলাম তোকে। চা-কফি খাবি কিছু?'

'হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ'। ঘন্টু বিনীতভাবে হেসে বলে—'কী যে বলেন! আমি আবার একটা মানুষ, যে মাখন মারবেন। তবে একটা কোল্ডড্রিঙ্ক হলে কিন্তু জমে যেত সার'।

অধিরাজ কথা না বাড়িয়ে বেল বাজাল। বেয়ারাকে দুটো কোল্ডড্রিঙ্কসের অর্ডার দিয়ে সে আবার ঘন্টুর দিকে ফিরল—'খবর ঠিকঠাক না হলে কিন্তু মাখন আর কোল্ড ড্রিঙ্কস—দুটোই তোর পেট থেকে বের করব মনে রাখিস'।

'আগে খবরটা তো শুনে নিন্'। ঘন্টু বলল—'দুটো খুনের পর যদি তৃতীয় কেউ মরে, তবে সেটা কপিল মিশ্রের বাপ সার! এক নম্বরের কামিনা! শুনেছি নাকি আর্মিতে ছিল। লোকে বলে, কপিলের মা'টাকে নাকি পুড়িয়ে মেরেছে! বাপ-ছেলের মধ্যে সলিড লোচা। রোজ রাত্রে ঝগড়া হয়! রাতের বেলা কাক-চিল বসার উপায় থাকে না! এই নিয়ে সোসাইটিতে অনেকেই পরাশরবাবুর কাছে কমপ্লেন করেছে'।

'তা এতই যখন ঝগড়া, তখন আলাদা থাকলেই পারে'। অধিরাজের ভুরুতে ভাঁজ পড়েছে—'একসঙ্গে থাকতে হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে?'

'পারবে না'। ঘন্টু মাথা নাড়ছে—' প্রপার্টি! কপিল আলাদা হয়ে যাবে কোথায়? ফ্ল্যাটটা তো বুড্ঢার নামে। বুড়ো রোজই ছেলেকে বেরিয়ে যেতে বলে। কপিলের তেমন পয়সা নেই। আলাদা থাকবে কী করে, খাবে কী, বৌকে

boierpathshala.blogspot.com

খাওয়াবে কী? করে তো ঐ ল্যাব-অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ'।

কথাটায় যুক্তি আছে। অধিরাজ মাথা নাড়ে। কিন্তু ঘন্টুর কথার তোড়কে প্রতিহত করে না। ছেলেটা একটু বেশি বকে ঠিকই, কিন্তু কাজের কথা বলে।

ইতিমধ্যেই কোল্ডড্রিঙ্কস এসে গিয়েছে। ঘন্টু মহাতৃপ্তিতে কোল্ডড্রিঙ্কসে চুমুক দেয়—'কপিলের পুরো জিন্দ্‌গি হেল করে রেখেছে বুড়োটা! ছেলেটা ভীষণ ডিপ্রেশনে ভোগে। একবার তো বাড়াবাড়ি হয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিল। পারেনি। এখন সাইকিয়াট্রিস্টের ওষুধ খেয়ে খেয়ে কোনমতে টিঁকে আছে। তবু মাঝেমধ্যেই নাকি কেমন ভোম্ মেরে বসে থাকে। কখনও কখনও কাজ করতে করতে ভুলে যায় যে কী করছিল। খুব খারাপ হালত ছেলেটার! অথচ বাপটার পয়সা আছে--কিন্তু বহুত কঞ্জুস! পাই পাই করে অনেক টাকা জমিয়েছে। সেই টাকায় বোধহয় এতদিনে ছাতাও পড়ে গেল! মরে যাবে, কিন্তু ছেলেকে একপয়সাও দেবে না। লিখে নিন্ স্যার, এরপরই ঐ লোকটারই নম্বর আসছে। যদি সাইকোটা ওকে নাও মারে, তবে কপিলই কোনওদিন ধরে উড়িয়ে দেবে'।

'ওকে'। অধিরাজ এতক্ষণ নিষ্পলকে তার দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল। এবার শ্বাস টেনে বলল—'তারপর?'

'আরেকটা মাল আছে স্যার। সোসাইটির সেক্রেটারি পরাশর চৌধুরী আছে না...?'

'কী বলছিস্'। অধিরাজ প্রতিবাদ করে—'ও লোকটা যথেষ্ট নরমসরম। ওরকম খেঁকুটে বাপ উনি হতেই পারেন না'।

'আরে সার! পুরোটা আগে শুনুন!' ঘন্টু মন্থরভঙ্গিতে বলে—'ওঁর উল্টোদিকের ফ্ল্যাটে ওঁরই ছেলে থাকে। পরাশরবাবুর ছেলেটা আরেক পিস্! তিন বছরের মেয়ে পিঙ্কি ভারি ফুটফুটে বাচ্চা। বৌটাও ভালো। কিন্তু ছেলেটা পুরো অপদার্থ। মদ গাঁজা তো খায়ই, ড্রাগস্‌ও নেয় কিনা কে জানে! আর যত দৌরাত্ম্য সব বাচ্চাটা আর বৌটার ওপরে। লিখে নিন সার, এই মক্কেলের কপালেও মরাই নাচছে! কেউ আটকাতে পারবে না। গড প্রমিস!'

'হুঁ'। অধিরাজের কপালে গভীর ভাঁজ পড়ল। অর্থাৎ আরও দুজন ভিক্‌টিম যে কোনও মুহূর্তে বিপন্ন হতে পারে। কিন্তু কে যাবে আগে? এবার কার পালা?

'আরেকটা খবর আছে সার'। ঘন্টু মাথা চুলকাচ্ছে—'খবরটা কত দূর কাজের জানি না। কিন্তু আপনার এক মক্কেল কিন্তু বেশ ভালোই ফেঁসেছে'।

'কে?'

'কপিল মিশ্র'। সে একটু দম নেয়—'লোকটা ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্টের চাকরি করে। ওদিকে ওদের ল্যাব থেকে এক শিশি ক্লোরোফর্ম কেউ চুরি করেছে। নিয়ম আছে না, সব ব্যাটাকে ছেড়ে বেঁড়ে ব্যাটাকেই ধর্! স্কুল কর্তৃপক্ষ ঐ দুখী আত্মাটাকেই এর জন্য দায়ী করছে। ওর গাফিলতির জন্য নাকি ক্লোরোফর্মের শিশি মিসিং। চাকরিটা গেল বলে'।

'কপিল মিশ্র'র ল্যাব থেকে ক্লোরোফর্মের শিশি মিসিং! এটা তো ব্রেকিং নিউজ রে!' অধিরাজ সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়—' গ্রেট! আর তোকে যে ব্যাকগ্রাউন্ডের খবর নিতে বলেছিলাম তার কীহল?'

ঘন্টু হতাশ ভাবে মাথা ঝাঁকায়—'বিতস্তা টাওয়ারসের বাসিন্দাদের পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড বের করা মুশকিল সার। তবু কিছু খবর পেয়েছি। যেমন কপিল মিশ্র'র কথা তো আগেই বলেছি। টিপিক্যাল দুখী আত্মা! ডঃ তেজেন বর্মন ছোটবেলা থেকেই অনাথ। একটা বেসরকারি অনাথ আশ্রমে বড় হয়েছেন। আগে-পিছে কেউ নেই। বিয়ে করেছিল। কিন্তু বৌটাও টিঁকল না! তবে...' ঘন্টুর গলা নীচে নেমে গেল। ফিস্‌ফিস করে বলল—' ওর যে ছেলেটা আছে না, ওটা ওর নিজের ছেলেও নয়। সেও অনাথ। ডঃ বর্মন ওকে দত্তক নিয়েছেন!'

boierpathshala.blogspot.com

‘আচ্ছা!’ অধিরাজ অন্যমনস্ক হয়ে রিভলভিং চেয়ারে দোল খাচ্ছে—‘তারপর?’

‘বিপুল রায়ের কথা কেউ বলতে পারল না। তার বাপ-মাকে কেউ দেখেনি। তবে লোকটা ছোটবেলা থেকে খুব স্ট্রাগ্‌ল করেছে। খুব স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে ছিল না। ও লোকটাও একটু কেমন যেন। বেশি কথা বলে না। বায়োলজির টিচার! কিন্তু প্র্যাকটিক্যালের সময় প্রায়ই ভুলভাল করে বসে থাকে। ছাত্র-ছাত্রীরা হাসাহাসি করে। ও লোকটাও বোধহয় মেন্টাল পেশেন্ট। অন্তত লোকে তাই বলে। তাই ওর সম্পর্কে বেশি কিছু জানা নামুমকিন। পরাশর চৌধুরীর বাপ-মা পরাশরের সঙ্গেই থাকেন। কিন্তু কোথাও অনাবিষ্টি তো কোথাও অতিবিষ্টি! পরাশর চৌধুরীর ছেলে যেমন মা-বাপকে পাত্তাও দেয় না, পরাশর লোকটি ঠিক তার উলটো। কোনওরকম কাজ করার আগে দশবার মা-বাবার সঙ্গে পরামর্শ করে! একেবারে বাপ-মা ভক্ত রামপ্রসাদ! আর অমিত মুখার্জীর মা-বাপ এখানে থাকে না। ওরা নাকি আসলে কৃষ্ণনগরের লোক। বৌয়ের সঙ্গে বনে না মায়ের! একেবারে টিপিক্যাল মেগাসিরিয়ালের সাস-বহু কেস। ছেলেটা বহুদিন মা-বৌয়ের মধ্যে পিংপং বল হয়ে ছিল। শেষে বিরক্ত হয়ে চাকরি নিয়ে কলকাতায় চলে এসেছে। এখানে টিচারি করে। মা-বাপকে অবশ্য একবারও আসতে কেউ দেখেনি।’

‘বুঝলাম’। অধিরাজ কয়েকটা পাঁচশো টাকার নোট তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল—‘ঠিক আছে, এখন তুই যা! তবে কানখাড়া রাখিস্। কোনওরকম খবর পেলেই বলবি’।

পুরো কান এঁটো করে হাসল ঘন্টু—‘একদম সার। কোনও খবর থাকলেই বলব। নিশ্চিন্ত থাকুন।’ বলতে বলতেই তার চোখে পড়ল কাকাতুয়াটা। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—‘এ কী সার! কাকাতুয়া কিনেছেন নাকি? আরে, আমাকে আগে বলতেন! আমি একটা দারুণ কাকাতুয়া একদম সস্তায় দিতে পারতাম!’

অধিরাজ কিছু বলার আগেই কাকাতুয়া বলে উঠল—‘চুপ কর্ মুখপোড়া!’

সে হেসে ফেলল—‘আমার দরকার নেই! তবে সস্তায় থাকলে বলিস্। ডঃ চ্যাটার্জীকে একটা গিফ্‌ট করব ভাবছি’।

৮.

অপরাধীর ডায়েরি

আমাকে ধরা অত সহজ নয়।

সহজ অবশ্য কখনই ছিল না। কারণ আমি চিরকালই সন্দেহের উর্ধ্বে থেকেছি। আর থাকবো না-ই বা কেন? আমার খুনগুলো করার যে কোনও কারণই নেই। যেখানে মোটিভ অব মার্ডারই নেই, সেখানে সন্দেহ করার প্রশ্নও ওঠে না। আমি সুপারি কিলার নই, কারোর সঙ্গে কোনরকম শত্রুতা নেই, প্রপার্টি বা প্রেমগত ব্যাপারও নেই। সচরাচর বেশিরভাগ খুনই হয়ে থাকে এই তিনটে কারণেই। শত্রুতা এবং প্রতিশোধ, বিষয় সম্পত্তি এবং নারী। যখন আমি ক্রাইম থ্রিলার পড়তে শুরু করি, অপরাধ-মনস্তত্ত্বের বই পড়ি—তখনই জানতে পেরেছিলাম এসব কথা। তাই মার্ডারের যখন মোটিভই পাওয়া যায় না, তখন অপরাধীকে ধরা শক্ত! জ্যাক দ্য রীপার পুলিশকে ল্যাজে-গোবরে করে রেখেছিল। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের এত নাকানি-চোবানি খাওয়ার একটাই কারণ—হত্যাগুলোর পেছনে কোনওরকম মোটিভ ছিল না! আমারও তেমন জোরালো কোনও মোটিভ নেই।

কিন্তু আমার মায়ের মোটিভ ছিল। খুন করার মোটিভ। আরও সবিস্তারে বলতে গেলে, নিজেকে খুন করার মোটিভ। মা আমার এত সাহসী ছিল না যে সেই লোকটাকে খুন করবে! আর কোনও রাস্তা খোলাও ছিল না। একটা মানুষ আর কত সহ্য করবে! অবশেষে একদিন সব জ্বালা জুড়োল।

সে রাত্রে মা আমায় তাড়াতাড়ি খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। মা ভারি সুন্দর ঘুম পাড়ানিয়া গান গাইতেন।

boierpathshala.blogspot.com

যখন তিনি গাইতেন—'ঝুঁটি বাঁধা কাকাতুয়া আয় না/ ধরেছে খোকন সোনা বায়না...' তখন মনে হত দুনিয়ায় কোনও যন্ত্রণা নেই। কোথাও কোনও সমস্যা নেই। আমার সামনে হাত বাড়িয়ে রয়েছে চিরসবুজ, চির দুরন্ত শৈশব! সেখানে কোনও মালিন্য নেই, কষ্ট নেই!

সে রাতেও মা এমনই গান গেয়েছিলেন। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বড় শান্তিতে ঘুমিয়েছিলাম। আকাশে তখনও তারাদের নরম আলো মিটমিটিয়ে জ্বলছিল। শিশির পড়ছিল টুপটাপ। ঘাসের গায়ে শিশিরের ঠান্ডা প্রলেপ মাড়িয়ে চলে যাচ্ছিল পথচারীরা। আস্তে আস্তে কখন যে আশেপাশের বাড়িগুলোর আলো টুকটুক করে নিভে গিয়েছে টের পাইনি। ঠান্ডা চাঁদ তখন নীলাভ নরম আলোয় মায়াবী রাতের রূপকথা বুনছে।

কিন্তু বাস্তবের প্রবল আঘাত তখনও অপেক্ষা করছিল...! আরও কয়েক ঘন্টা পরে...আরও গভীর রাতে...!

মা রোজ গা ধুত। তারপর পাউডার, ক্রিমের মিষ্টি গন্ধ মেখে এসে ঠিক আমার পাশে শুয়ে পড়ত। সেদিনও মা গা ধুয়েছিল। তফাত একটাই। জলে নয়, কেরোসিনে। পাউডার নয়, মায়ের গায়ে সেদিন কেরোসিনের গন্ধ ছিল...!

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আচমকা একটা শোরগোলের শব্দ শুনে ধড়মড় করে উঠে বসলাম। শৈশবের নিষ্পাপ চোখ অবাক হয়ে দেখেছিল মা জ্বলছে! মা একটা আগুনপাখির মত ডানা ঝাপ্টে মরছে! আর সেই লোকটা ভয়ের চোটে বাড়ির বাইরে দৌড়চ্ছে! বাঁচানোর চেষ্টাও করছে না!...মায়ের সেই চিৎকার আজও আমার কানে বাজে...! ভুলতে পারিনি...ভোলা যায় না...!

মা আমার চোখের সামনে শেষ হয়ে গেল! সেই লোকটার দেওয়া যন্ত্রণা কি এতটাই অসহ্য ছিল যে তার পাশে আগুনের সর্বগ্রাসী, সর্বনাশী জ্বালাও সহ্য করা সহজ হয়ে দাঁড়াল! খুব জানতে ইচ্ছে করে, মা কি একবারও আমার কথা ভাবেনি? বড় অভিমান হয়। কান্না পায়। যখন সবকিছু ফেলে চলে যাওয়ারই ছিল, তখন আমাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল না কেন! ঐ একটা রাতই আমায় অনাথ করে দিয়ে গেল। মা চলে গেল। আর সেই লোকটাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল। দেখলাম মাথার ওপরে বিরাট আকাশ, পায়ের তলায় অনন্ত ধরিত্রী—আর সেখানে আমি একা দাঁড়িয়ে রয়েছি।...

তারপর আমার জায়গা হল অনাথ আশ্রমে। বড় হতে হতে ভাবতাম, একদিন সেই লোকটাকে আমি মেরে ফেলব। মায়ের অমন যন্ত্রণাদায়ক বীভৎস মৃত্যুর প্রতিশোধ নেব। একদিন আমি ওকে ঠিক খুন করব। অনাথ আশ্রমের শান্তিপূর্ণ ঠান্ডা আবহাওয়া, ক্ষমাসুন্দর ভাবনা-চিন্তা, শিক্ষাও মনের জ্বালা কমাতে পারেনি। আমি রোজ রাতে জেগে থাকতাম, আর মনে মনে ফুঁসতাম। বদলা নেব...বদলা নেব...! অনাথ আশ্রমের ডাক্তারেরা এই মানসিক অবসাদ, ভয়ানক জিঘাংসা নির্মূল করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। অনেকবার আমাকে অ্যাসাইলামে ভর্তি করেছে। অনেক ওষুধও দিয়েছে। কিছুতেই কিছু হয়নি!

পিঙ্কির বাবাও অবিকল সেই লোকটার মত! ওকে পশুপতির মত আরামের মৃত্যু দেব না। পিঙ্কি আর ওর মায়ের ওপরে যে অত্যাচার করেছে, যে যন্ত্রণা ওরা রোজ ভোগ করে, সেই যন্ত্রণার খানিকটা পেতে পেতে ওকে মরতে হবে। আমার প্রতিজ্ঞা ছিল, সেই লোকটাকে মারব! আর পরিতোষ দত্ত, রজত গাঙ্গুলি, প্রিয়মের বাবা—রঞ্জিত বসু, রিকুর বাবা—পশুপতি—ওদের সবার মধ্যে আমি সেই লোকটাকে দেখেছি! আর যতবার ওকে দেখব, ততবারই মারব। যতবার ও নতুন নতুন রূপ নিয়ে আমার সামনে আসবে—আমি ওকে খুন করব।

একটাই অবশ্য অসুবিধে। এখন বিতস্তায় পুলিশ প্রহরা বসেছে। কয়েকটা বন্ধ ফ্ল্যাট খুলিয়ে তার মধ্যে ঢুকে বসে আছে সাদা পোষাকের পুলিশেরা। সবসময়ই চতুর্দিকে সতর্ক নজর রাখছে। যখন তখন টহল দিচ্ছে। কিন্তু আমায় আটকাতে পারবে না। আমার কোনও ভয় নেই। যখন একটা মানুষ আর শাস্তির ভয় পায় না, তখন তাকে ঠেকানোর ক্ষমতা স্বয়ং ঈশ্বরেরও নেই।

শুধু বিতস্তায়ই নয়, প্রত্যেকটা পিৎজা কর্নারের পার্লারের সামনে সাদা পোষাকের পুলিশ ঘুরছে! ব্যাপার দেখে

boierpathshala.blogspot.com

বেশ হাসি পাচ্ছে। একা আমার জন্য গোটা কলকাতা পুলিশ, সি আই ডি নেমে পড়েছে মাঠে। জ্যাক দ্য রীপারের মত আমিও ঘোল খাওয়াচ্ছি ওদের!

পিঙ্কির বাবাও অবিকল সেই লোকটার মত। নিষ্ঠুর, নির্মম! বৌ, মেয়ের জীবন অতিষ্ঠ করে রেখেছে! ওকেও সরাতে হবে! এখন ওর অত্যাচার থামানোর সময় এসেছে!

আই হেট ইউ! আই হেট ইউ বাবা!

বিতস্তা টাওয়ারস্ থেকে সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ এসে হাজির হয়েছে। হাজির হয়েছেন পাঁচজন প্রিলিমিনারি সাসপেক্টও। পরাশর চৌধুরী, বিপুল রায়, অমিত মুখার্জী, ডঃ তেজেন বর্মন ও কপিল মিশ্র। আপাতত ওরা ইন্টারোগেশন রুমের বাইরে বসে আছেন। অর্নব মুখ দেখেই বুঝল, প্রচন্ড মানসিক চাপে আছেন ওরা। কপিল মিশ্র পায়চারি করছেন, এবং মাঝেমধ্যেই নীচুস্বরে অমিত মুখার্জীর সঙ্গে কী যেন আলোচনা করে যাচ্ছেন। অর্নব লক্ষ্য করে দেখেছে যে কপিল খুব বেশি কথা বলেন না। বরং অন্যান্যদের তুলনায় একটু বেশিই চুপচাপ। এমনিতে উপর থেকে দেখলে বিশেষ কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু তার চোখ দুটো অদ্ভুত উদ্ভ্রান্ত। দেখলেই মনে হয়, আর যাই হোক্, লোকটি খুব স্বাভাবিক নয়।

অমিত মুখার্জী মাঝেমধ্যেই বাইরে চলে যাচ্ছেন, এবং সিগারেটের পর সিগারেট টেনে চলেছেন। পরাশরবাবু থেকে থেকেই নিজের চুল আঁচড়ে নিচ্ছেন, এবং কেয়ারিটিকে প্রাণপণ ঠিকঠাক রাখার চেষ্টা করছেন। ডঃ তেজেন বর্মন এক খামচা পান-সুপারি মুখে দিয়ে বসে আছেন। মাঝেমধ্যেই পকেট থেকে জর্দার প্যাকেট বের করে মুখে কয়েক চিমটি দিয়ে নিচ্ছেন। এদের মধ্যে একমাত্র বিপুল রায়েরই কোনও হেলদোল নেই। তিনি চুপচাপ বসে আছেন। কেমন যেন ঘুম ঘুম ভাব। যেন এইমাত্রই তাকে ঘুম থেকে তোলা হয়েছে। ওর মনে হল, হয়তো ভদ্রলোক কোনও স্ট্রং সেডেটিভ নিয়েছিলেন কাল রাতে। তার ঘোর এখনও কাটেনি। অর্নবকে দেখে জানতে চাইলেন—'খুব দেরি হবে?'

উত্তরে অর্নব কী বলবে বুঝতে না পেরে মৃদু হাসল। দেরি হওয়া বা না হওয়া তার উপরে নির্ভর করে না। তাছাড়া এই মুহূর্তে তাকে বেরোতে হবে। তাই কোনও কথা না বলে একটা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে সে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দশেক আরও অপেক্ষা। যখন ওরা প্রত্যেকেই ভেতরে ভেতরে অধৈর্য হয়ে উঠেছেন ঠিক তখনই ভেতর থেকে একজন এসে বলল—'স্যার ডাকছেন'।

পাঁচজনই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। অফিসারটি বলল—'একসঙ্গে নয়, এক এক করে আসুন'।

ডঃ তেজেন বর্মনের বোধহয় তাড়া ছিল। তিনি অন্যদের দিকে তাকিয়েছেন—'আমি আগে সেরে আসি?'

বাকিরা সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়ায়। ভদ্রলোক দুরুদুরু বুকে, সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকলেন।

ভেতরে তখন অধিরাজ খুব মনোযোগ দিয়ে বিতস্তা টাওয়ারসের সিসিটিভি ফুটেজ গুলো দেখছিল। পশুপতিবাবুর বাড়িতে সিসিটিভি আছে। এই মুহূর্তে মৃত্যুর আগের মুহূর্তটাই বারবার রিওয়াইন্ড করছে সে। কপালে চিন্তার ভাঁজ। ডঃ তেজেন বর্মনকে দেখে বলল—'আসুন...আসুন। বসুন এখানে'।

ডঃ বর্মন তার সামনের চেয়ারটায় বসে পড়লেন। মুখের পান সুপারি সাইড করে বললেন—'যদি আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেন, তবে বড় ভালো হয়। আমার পেশেন্টরা ক্লিনিকে অপেক্ষা করছে। বেশ কয়েকবার ফোনও এসে গেছে'।

'নিশ্চয়ই'। অধিরাজ বিনম্র কণ্ঠে বলে—'এক্ষুনি ছেড়ে দেব। জাস্ট কয়েকটা প্রশ্ন'।

boierpathshala.blogspot.com

ডঃ বর্মন মাথার ঘাম মুছলেন।

‘পরিতোষ দত্ত বা রজত গাঙ্গুলিকে চিনতেন?’

প্রথম প্রশ্নেই বাউন্সার। ভদ্রলোক ঢোঁক গেলেন—‘হ্যাঁ, চিনতাম। একই কলোনিতে থাকতাম বছর তিনেক আগে। আমি দুজনেরই হাউজ ফিজিশিয়ান ছিলাম’।

‘ওদের খুনের ঘটনাটা জানতেন?’

‘হ্যাঁ, শুনেছি। কলোনির সবাই জানত’। বলেই চুপ করে গেলেন তিনি। অধিরাজ তখনও সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। হয়তো আরও কিছু আশা করেছিল। কিন্তু ডঃ বর্মন আর মুখ খুললেন না। সে বাধ্য হয়েই অন্য রাস্তা ধরে--

‘পশুপতিবাবুর সঙ্গে আপনাদের সবার কেমন সম্পর্ক ছিল?’

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। বোধহয় উত্তরটা মনে মনে সাজিয়ে নিলেন। তারপর বললেন—‘ভালো। পশুপতি এমনিতে মাই ডিয়ার লোক ছিল। নিজে গান গাইতে বা বাজাতে না পারলেও সঙ্গীতরসিক ছিল’।

‘আর মানুষ হিসাবে?’ অধিরাজের চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

‘দেখুন, কারোর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কিছু বলা উচিত নয়। বিশেষ করে মৃত ব্যক্তির!’ ডঃ বর্মন আস্তে আস্তে বললেন—‘তবে ও ফ্যামিলিম্যান হিসাবে খুব কড়া ছিল’।

‘কড়া, না অত্যাচারী?’

‘এ বিষয়ে কিছু বলা আমার শোভা পায় না!’ তিনি ছেলেমানুষের মত কাঁধ ঝাঁকালেন—‘তাছাড়া পশুপতিকে খুব বেশিদিন আমি চিনি না। আমাকে ওর সঙ্গে পরাশর আলাপ করিয়ে দেয়। পরাশর আমার বহুবছরের বন্ধু। প্রায় ছেলেবেলা থেকে চিনি। যদিও মাঝখানে অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু বিতস্তায় আসার পরই ফের দেখা হল। ওর মাধ্যমেই পশুপতি, কপিল, অমিত, বিপুলদের সঙ্গে আলাপ। তারপর থেকে উইক এন্ডের আড্ডায় আমরা একসঙ্গে যেতাম। ব্যস্ এইটুকুই’।

‘সেদিন যে বিপুলবাবু অন্য পানীয়ের বদলে জিরো কোলার বোতল আনবেন তা আপনারা সবাই জানতেন?’

এইবার ভ্দ্রলোককে বেশ নার্ভাস দেখাল—‘হ্যাঁ। প্রত্যেকেই জানতাম। এমনিতে স্ন্যাকসের দায়িত্ব পশুপতির থাকত, আর বিপুল ড্রিঙ্কসের ব্যাপারটা দেখত। বেশির ভাগ সময়ই ফ্রুট জুস বা লস্যি চলত। অবশ্য আমরা প্রত্যেকেই প্রতি সপ্তাহে চাঁদা দিতাম। চাঁদা দেওয়ার সময়ই ঠিক হয়ে যেত পরের সপ্তাহের মেনু’।

‘তার মানে আপনারা একসপ্তাহ আগে থেকেই জানতেন যে পরের সপ্তাহে ড্রিঙ্কসে ফ্রুট জুস বা অন্য কিছু নয়, কোলা থাকছে। ’

‘হ্যাঁ। প্রথমে পশুপতি আপত্তিও করেছিল। ওর ক্যাফেইনে অ্যালার্জি ছিল কিনা! কিন্তু বিপুল বলল ‘জিরো কোলায়’ ক্যাফেইন নেই। তারপর ও আর আপত্তি করেনি’।

অধিরাজ একটু থেমে ফের বলল—‘ঘটনার দিন ঠিক কী কী হয়েছিল মনে করে বলুন তো। এমন কিছু ঘটেছিল যা অস্বাভাবিক?’

ডঃ বর্মন মুখ মুছলেন—‘তেমন কিছুই হয়নি। প্রত্যেক সপ্তাহের মতই সেদিনও আমরা প্রথমে পরাশরের বাড়ি যাই। যতক্ষণ না পশুপতির ছেলে টিউশনে যায় ততক্ষণ আসর বসে না। তাই আমরা প্রথমে পরাশরের বাড়িতে মিট করি। তারপর পশুপতি ফোন করে ডাকলে একসঙ্গেই চলে যাই। সেদিনও তাই হয়েছিল। আমরা পরাশরের

boierpathshala.blogspot.com

বাড়িতে আই এফ এলের ম্যাচ দেখছিলাম'।

অধিরাজ এবার পরাশরবাবুর বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজের সিডি চালাল। ডঃ তেজেন বর্মন মিথ্যে বলেননি। সত্যিই পরাশরবাবুর বাড়িতে এক এক করে জমা হচ্ছেন ওরা। প্রথমে বিপুলবাবু এলেন, হাতে কোলার বোতল। তারপর অমিত মুখার্জী, এরপর একে একে ডঃ বর্মন ও কপিল মিশ্র। টিভিতে আই এফ এলের ম্যাচ হচ্ছে।

'আপনি ঘোড়ার বিষয়ে ইন্টারেস্টেড?'

'অ্যাঁ!' তিনি এমন চমকে উঠলেন, যেন আরেকটু হলেই চেয়ার থেকে পড়ে যাবেন—'ঘোড়া! কেন?'

'না'। অধিরাজ তাকে আশ্বস্ত করে—'এমনিই। জাস্ট কৌতুহল। অনেকেই তো ঘোড়া পছন্দ করেন! চড়েছেন কখনও?'

'নাঃ চড়িনি!' ভদ্রলোক ঠোঁট চেটে উত্তর দিলেন—'বেড়াতে গিয়েও আমি ঘোড়ায় চড়ি না! ভয় করে। তাছাড়া আমার ভার্টিগো আছে'।

'ওকে'। সে একটা শ্বাস টানে—'এখন আপনি যেতে পারেন। আর কোনও প্রশ্ন নেই। তবে কিছুদিন আপাতত শহর ছেড়ে যাবেন না। যতক্ষণ না খুনী ধরা পড়ছে ততক্ষণ তো নয়ই। আপনি বেরিয়ে পরাশরবাবুকে পাঠিয়ে দিন'।

ডঃ তেজেন বর্মন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। পানের ডিবে খুলে আরও গোটা দুয়েক পান মুখে পুরে ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়েন। তারপর যেমন সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে এসেছিলেন তেমনই ভয়ার্ত পদক্ষেপে চলে গেলেন। অধিরাজ ঘাড় ঘুরিয়ে কাকাতুয়াটার দিকে তাকায়। সে তখন একটা লাল লঙ্কায় মনোনিবেশ করেছে। ডঃ বর্মনকে দেখে তার কোনও প্রতিক্রিয়া হল না!

কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। তারপরই পরাশরবাবু ঢুকলেন। মুখের অবস্থা খারাপ। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও তার চুলের কেয়ারিটি ঠিকঠাক আছে। কুন্ঠিত ভাবে চেয়ার টেনে বসে পড়লেন। অস্ফুটে বললেন—'বলুন'।

অধিরাজ যথারীতি পরিতোষ দত্ত এবং রজত গাঙ্গুলির বিষয়ে প্রশ্ন করল। তিনি জানালেন—'পরিতোষ দত্তকে চিনি না। কিন্তু রজত গাঙ্গুলিকে চিনি। উনি আমার বস্ ছিলেন'।

'কেমন লোক ছিলেন?'

সপাটে জবাব এল—'অত্যন্ত বাজে লোক। এমন কোনও দোষ নেই যা ওঁর ছিল না'।

'ওর খুন হয়ে যাওয়ার খবর পেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ'। পরাশরবাবু একটু ধাতস্থ হলেন—'তেজেন জানিয়েছিল। বলাই বাহুল্য বিশেষ দুঃখ পাইনি'।

এতটা স্পষ্ট জবাব আশা করেনি অধিরাজ। একটু থেমে বলল—'যেদিন পশুপতিবাবু মারা গিয়েছিলেন, সেদিন সবাই রুটিন অনুযায়ী প্রথমে আপনার বাড়িতেই মিট করেছিলেন?'

তিনি একটু থেমে জবাব দেন—'হ্যাঁ। প্রত্যেকবারই তাই হয়'।

'সেদিন কে কখন এসেছিলেন মনে আছে?'

'একদম প্রথমে বিপুল এসেছিল। ও কোলার বোতল নিয়ে এসেছিল। তারপর অমিত। তারপর তেজেন, শেষে কপিল!' ওর চোখে কৌতুহল—'কেন বলুন তো?'

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ একটু চুপ করে থাকে। যেন ভাবছে প্রশ্নের উত্তরটা দেবে কি না। একটু ভেবে জবাব দিল—'দেখুন পরাশরবাবু, সেদিন বিপুলবাবু জিরো কোলার বোতল এনেছিলেন এটা যেমন সত্যি, তেমনই এটাও সত্যি বোতলটাকে বদলে দেওয়া হয়েছিল। হয় বিপুল বাবু নিজে বদলেছেন...!'

'না...না!' পরাশরবাবু প্রতিবাদ করে ওঠেন—'বিপুল কেন বদলাবে? ওর পশুপতির সঙ্গে কোনও শত্রুতা নেই'।

'তবে কার সঙ্গে শত্রুতা ছিল?'

'মানে?' তিনি স্তম্ভিত।

'দেখুন স্যার...' বিনীত ভাবেই বলে অধিরাজ—'যদি বিপুলবাবু নিজে না ড্রিঙ্কটা বদলে দেন, তবে উপস্থিত আপনাদের চারজনের মধ্যে কেউ না কেউ ড্রিঙ্কটাকে পাল্টেছিল। তাই খুব ভেবে পরের প্রশ্নটার উত্তর দেবেন। এমন কোনও মুহূর্ত কি ছিল যে যখন আপনারা কেউ বোতলটার কাছে ছিলেন না। আই মিন, এমন কি কখনও হয়েছিল যে বোতলটা আপনার ড্রয়িংরুমের সোফায় পড়ে ছিল। অথচ ধারেকাছে আপনারা কেউ ছিলেন না!'

খুব গভীর মনোসংযোগে সেদিনের ঘটনাটা ভাবছিলেন পরাশর চৌধুরী। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে বললেন—'তেমন কিছু মনে পড়ছে না। যখন প্রথমদিকে আমি আর বিপুল ছিলাম, তখন বোধহয় বিপুল একবার সিগারেট খেতে বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু তখন তো আমি ওখানে ছিলাম। তাও বেশিক্ষণের জন্য নয়। ও বেরিয়ে যাওয়ার সময় একটা গোল হল। এরপর বাকিরা এসে পড়ল। তখন থেকে আর কেউ বাইরে যায়নি। তাছাড়া আমার ঘরে সিসিটিভি আছে। যদি তেমন কিছু হয়, তবে ক্যামেরাতেই ধরা পড়বে'।

অধিরাজ সিসিটিভি ফুটেজটাকে ফার্স্ট ফরোয়ার্ড করে। হ্যাঁ, পরাশরবাবু সত্যি কথাই বলছেন। একদম প্রথম দিকে বিপুলবাবু ও তিনি ছিলেন। টিভিতে আই এফ এলের খেলা চলছে। দুজনে কী যেন বলাবলি করছেন। তার কিছুক্ষণ পরে বিপুলবাবু বেরিয়ে গেলেন। পরাশরবাবু একাই স্থির হয়ে বসে টিভি দেখছেন। পাশে জিরো কোলার বোতল। ওদিকে বিরাট স্ক্রিনের টিভিতে আই এফ এলের খেলা জমে গিয়েছে। একটা গোল হল! গোলদাতাকে ঘিরে সহ-খেলোয়াড়দের বেশ কিছুক্ষণের উচ্ছ্বাস। পরক্ষণেই ফের খেলা শুরু হয়ে গেল। বিপুলবাবুও ফিরে এলেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিসিটিভি ফুটেজটাকে পজ করল অধিরাজ। তারপর রুটিন প্রশ্ন গুলো একের পর এক করে গেল। পরাশরবাবুর সঙ্গে তেজেন বর্মনের কথার কোনও অমিল নেই। হ্যাঁ, ওরা একসপ্তাহ আগে থেকেই জানতেন যে বিপুলবাবু এবার জিরো কোলা আনবেন। তা নিয়ে প্রথমে পশুপতিবাবু আপত্তি করলেও পরে মেনে নেন্। না, তিনি কোনোদিন ঘোড়ায় চড়েননি—ইত্যাদি ইত্যাদি...!

মোটামুটি সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যখন উঠে যাচ্ছেন পরাশর চৌধুরী, ঠিক তখনই অধিরাজ বলে উঠল-- 'আপনার ছেলের দিকে একটু নজর রাখবেন স্যার!'

ভদ্রলোক এবার যেন ভয় পেলেন। আঁৎকে উঠে ভয়ার্ত স্বরে বললেন—'মানে?'

'যা পরিস্থিতি তাতে কেউই খুব সুরক্ষিত নয়'। সে ব্যাপারটাকে একটু সহজ করে দেয়—'নিজেরা তো সাবধানে থাকবেনই। ছেলে-মেয়েদের দিকেও নজর রাখবেন। সোসাইটিতে একটা সাইকো-কিলার ঘুরে বেড়াচ্ছে, ব্যাপারটা মোটেই স্বস্তির নয়। আর আপনার ঘরে একটা মিষ্টি নাতনিও তো আছে। তার দিকেও খেয়াল রাখবেন'।

পরাশরবাবু একটা উদ্বিগ্ন দৃষ্টিপাত করে চলে গেলেন। বোঝাই গেল, শেষ কথাটা তাকে যথেষ্ট চিন্তান্বিত করে তুলেছে। অধিরাজ ফের কাকাতুয়াটার দিকে তাকায়! তার কোনও হেলদোলই নেই! সে প্যাট্‌প্যাট্ করে তার দিকে ভাবুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। যেন এখনই একটা কাগজ কলম দিলে হুড়মুড় করে কবিতা লিখতে শুরু করবে। অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এবারও কোনও রি-অ্যাকশন নেই।

boierpathshala.blogspot.com

পরাশরবাবুর পরেই কপিল মিশ্র ঢুকলেন। তাকে রুটিন প্রশ্নগুলো করেও তেমন কিছু জানতে পারল না অধিরাজ। হয় ভদ্রলোক প্রয়োজনের বেশি চালাক, নয়তো টিপিক্যাল ভোম্বল! কথার মধ্যে এত স্পিডব্রেকার যে পঞ্চাশবার হোঁচট খেতে হয়। অন্যান্য শব্দের চেয়ে 'ইয়ে' আর 'মানে' বেশি বলেন। থুতিয়ে থুতিয়ে যেটুকু উত্তর দিলেন, তার বেশিরভাগটাই প্রথম দুজনের কথার সঙ্গে মেলে! অধিরাজ লক্ষ্য করল, কথা বলতে বলতে কপিল সামান্য তোৎলান। রুটিন প্রশ্নগুলো করেই ব্রহ্মাস্ত্রটা ছাড়ল সে—

'আপনার ল্যাব থেকে সম্প্রতি ক্লোরোফর্মের শিশি চুরি গিয়েছে?'

কপিল যেন একটু কেঁপে উঠলেন। ইতস্ততঃ করতে করতে বললেন—'অ্যাঁ? হ্যাঁ! তা গিয়েছে! না...মানে, চুরি যায়নি—ইয়ে, হয়তো হারিয়ে গিয়েছে বোধহয়!'

'কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ তো বলছে যে চুরি হয়েছে'।

'তাই বলেছে!' কপিল কিছুক্ষণ ভেবে বললেন—'তাহলে হয়তো চুরি গেছে'।

'হয়তো চুরি গেছে মানে?' অধিরাজের কণ্ঠস্বর কড়া—'আপনার ল্যাব থেকে গেল, আর আপনি জানেন না?'

'না...কী জানি! হয়তো আমি নিজেই কোথাও রেখেছি...কিংবা কেউ হয়তো নিয়েছে...আমি ভুলে গেছি'।

'কোথায় রেখেছেন? কাকে দিয়েছেন?'

'কী জানি। মনে পড়ছে না। অমিতকে দিতে পারি। ও কেমিস্ট্রি পড়ায়। প্র্যাকটিক্যালের কাজে লাগে...! অথবা বিপুলদাকে। ব্যাঙের ইন্টারসেকশন করার আগে দরকার পড়ে। ব্যাঙগুলোকে ক্লোরোফর্ম দিয়েই অজ্ঞান করা হয় কিনা!'

'অমিত মুখার্জী বা বিপুল রায় ছাড়া আর কেউ? আর কেউ কি কখনও আপনার ল্যাবে ঢুকেছিল?'

'হ্যাঁ'। তিনি আবার ভাবলেন—' ডঃ বর্মনের ক্লিনিক স্কুলের কাছেই। কখনও কখনও উনিও লাঞ্চে আসেন। পরাশরদাও দেখা করতে আসেন'।

'যেদিন ক্লোরোফর্ম চুরি যায়, সেদিন এদের মধ্যে কে বা কারা এসেছিলেন?'

কপিল বেশ কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। চুলের মুঠি খামচে ধরে শুকনো গলায় বিচলিত ভঙ্গিতে বললেন—'জানি না...আমি...আমার কিছু মনে পড়ছে না! আমি কিচ্ছু জানি না...!'

অধিরাজ আড়চোখে কাকাতুয়ার দিকে তাকায়। সে তখনও নির্লিপ্ত মুখে বসে আছে! কোনও প্রতিক্রিয়াই নেই।

কপিলের পর অমিত মুখার্জী এলেন। তার সহজাত বাতুলতা এই মুহূর্তে নেই। বরং মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছে। নার্ভাসনেসের দরুণ একটু গলা কেঁপে যাচ্ছে। তবু নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছেন। পশুপতিবাবুর মৃত্যুর দিনের ঘটনাগুলো ঠিকঠাকই বললেন। তার কথার সঙ্গে বাকি তিনজনের বয়ানও মিলছে। কথা বলতে বলতে বেশ খানিকটা সহজও হলেন। এবং সহজ হওয়া মাত্রই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল বেফাঁস কথা—

'পশুপতিদার মৃত্যুটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে বৌদি আর রিকু বেঁচেছে'।

অধিরাজ চোখ কুঁচকে তাকায়—'কীরকম?'

'আর বলবেন না'। অমিত আফসোসসূচক আওয়াজ করেন—'বাচ্চাটাকে মারধোর করে রাখত না পশুপতিদা। বৌদির গায়ে হাত তোলেনি বটে, কিন্তু বৌদি খুব একটা খুশি ছিল না। রিকু এমনিতে পড়াশোনায় ভালো। কিন্তু

boierpathshala.blogspot.com

সবসময়ই কি একটা লোক নিজের স্ট্যান্ডার্ড মেইনটেইন করতে পারে বলুন? শচীন তেন্ডুলকর তো মহান প্লেয়ার। কিন্তু তাই বলে কি তিনি কখনও জিরো করেননি?'

'তা ঠিক'।

'আর এই কথা বোঝাতে বোঝাতে আমরা সবাই ফেড-আপ হয়ে গিয়েছিলাম। রিকুর মার্কস্ একটু কম হলেই, পান থেকে চুন খসলেই পশুপতিদা ওর ওপরে টর্চার শুরু করে দিতেন। খেতে দিতেন না। বেত মারতেন। আমিও একটা স্কুলে টিচারি করি। সেখানেও ব্রিলিয়ান্ট আর মাথামোটা ছাত্র দুইই পড়ে। অনেক সময়ে ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্টদেরও ভুল হয়। আমি বারবার সেকথা বলেছি। কিন্তু পশুপতিদা কিছুতেই মানবেন না! বলুন, এটা কি ঠিক?'

অধিরাজ টেবিলের ওপরের পেপারওয়েটটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে ওর কথা শুনছিল। আস্তে আস্তে বলল—'সম্ভবত প্রিয়মের বাবাও অত্যাচারী ছিলেন, তাই না?'

'ওরে বাবা! সে তো আরেক আপদ। সোসাইটির কারোর সঙ্গে বনত না। একগাদা কুকুর-বেড়াল পুষে স্বভাবটাও জংলী হয়ে গিয়েছিল। রোজ গন্ডগোল, রোজ মারপিট, চিৎকার চেঁচামেচি। উৎপাতের চোটে তো বিপুলদা অতিষ্ঠ হয়ে পরাশরদাকে কমপ্লেন করেছিলেন। রুমাবৌদি আর প্রিয়মও বেঁচেছে!'

'পরিতোষ দত্ত আর রজত গাঙ্গুলি সম্পর্কে আপনার কী মতামত?'

এবার যেন একটু থমকালেন অমিত। একটু থেমে বললেন—'ওরাও একই গোয়ালের গরু। নিজেদের ফ্রাস্ট্রেশন বাচ্চাগুলোর ওপর ঝাড়ে। আমি খুব ভালো করেই চিনতাম। ইনফ্যাক্ট গার্জিয়ান কলও করেছিলাম। বোঝানোর অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। এরা বোঝার লোকই নয়! এদের জন্য একটাই দাওয়াই ঠিক। লাঠৌষধি!'

'হুঁ'। সে পেপারওয়েটটাকে টেবিলের ওপর রেখে অমিতের দিকে ঝুঁকল—'বাস্তবে লাঠৌষধির চেয়ে একটু বেশিই কড়া শাস্তি হয়ে গেল না?'

অমিত আবার থমকালেন। একটু থেমে যোগ করলেন—'তা ঠিক। খুন করে ফেলাটা একটু বাড়াবাড়ি'।

বুলেটের মত প্রশ্ন এল—'কী করে জানলেন যে ঠিক এই কারণেই খুন হয়েছেন ওরা?'

এবার ভদ্রলোক আক্ষরিক অর্থেই ঘাবড়ে গেলেন! আমতা আমতা করে বললেন—'না!...মানে, আমার মনে হয়েছে...!'

'ও! আপনার মনে হয়েছে। বেশ!' অধিরাজ মৃদু হেসে পরের প্রসঙ্গে যায়—'আপনাদের স্কুলের ল্যাব থেকে নাকি ক্লোরোফর্মের শিশি চুরি গিয়েছে?'

এবার আবার সহজ হলেন অমিত—'ধুস্, চুরি টুরি কিছুই যায়নি। কপিলই কোথায় রেখে দিয়েছে দেখুন'।

'কিন্তু কপিলবাবু যে বলছিলেন শিশিটা আপনাকে দিয়েছিলেন'। নির্বিকার মুখে মিথ্যে কথাটা বলল অধিরাজ—'আপনার কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যালে প্রয়োজন ছিল'।

ভদ্রলোক এবার ভয়ঙ্কর চটে গেলেন—'কপিল বলেছে? মহা মিথ্যেবাদী তো! একেই ও সব ভুলে যায়, তার উপর আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে! আমি ওর কাছ থেকে একবারই ক্লোরোফর্ম নিয়েছিলাম। টেফলন রেডি করার জন্য দরকার ছিল। তাও অন্তত ছ'মাস আগে। তাছাড়া আমি একা কেন? বিপুলদারও তো ঘন ঘন ক্লোরোফর্ম লাগে বায়োলজির প্র্যাকটিক্যালের জন্য। ওকে ও তো দিতে পারে!'।

boierpathshala.blogspot.com

‘ও!’ সে বলল—‘টেফলনের জন্য ক্লোরোফর্ম দরকার ছিল! আচ্ছা, আপনি তো কেমিস্ট্রির লোক। কোলা থেকে ক্যাফেইন আলাদা করতে জানেন?’

‘সে আর এমনকি শক্ত! ট্রাইক্লোরোমিথেন বা ইথাইল অ্যাসিটেট ঢেলে দিলেই তো...!’

তাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই বলল অধিরাজ--‘ট্রাইক্লোরোমিথেন মানে তো ক্লোরোফর্ম। তাই না?’

অমিত একেবারে ফুটো হয়ে যাওয়া বেলুনের মত চুপসে গেলেন! অধিরাজ আড়চোখে তার দিকে একবার তাকিয়ে কাকাতুয়াটার দিকে তাকায়। কাকাতুয়াটা ঘাড় কাত করে অমিতকে একবার দেখে নিয়ে কড়কড় করে বলে উঠল—‘তোকে ভেজে খাব’।

এরপরে এলেন বিপুল রায়। হাবভাব একেবারে ভিজে বেড়ালের মত। তার বক্তব্যও প্রথম চারজনের সঙ্গে মিলে গেল! অধিরাজ জানতে চাইল—‘আপনারা তো এতদিন ফ্রুট জুস বা লস্যি খেয়েই চালাতেন। হঠাৎ কোলা আনতে গেলেন কেন?’

‘সেরকম ব্যাপার কিছু নয়’। তিনি উত্তর দেন—‘একদিন পশুপতিই বলেছিল যে ফ্রুট জুস খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গিয়েছে। তাই একটু ডিফারেন্ট টেস্ট আনার জন্য এনেছিলাম। তাছাড়া জিরো কোলা রিসেন্টই লঞ্চ করেছে। ক্যাফেইন ফ্রিও বটে। তাই ভাবলাম নিয়ে আসি’।

‘ডিফারেন্ট টেস্ট!’ অধিরাজ একটু ভেবে বলে—‘আপনি কি এর মধ্যে কখনও কপিলবাবুর কাছ থেকে ক্লোরোফর্ম নিয়েছিলেন আপনার বায়োলজি প্র্যাকটিক্যালের জন্য?’

‘এই প্রশ্নটা আমাকে আগেও স্কুল কর্তৃপক্ষ করেছে। কিন্তু আমি গোটা উইকেও ওর কাছ থেকে ক্লোরোফর্ম নিইনি। এখন পরীক্ষা চলছে। তাই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস বন্ধ।

‘আচ্ছা!’ অধিরাজ বলল—‘আরেকটা কথা জিজ্ঞাসা করেই আপনাকে ছেড়ে দেব’।

‘বলুন’।

‘যে রাতে প্রিয়মের বাবা মারা যান, সেদিন আপনি নিজের ঘরে ডাব্‌ল্‌ তালা দিয়ে বসেছিলেন—এটা সত্যি?’

‘সত্যি’। তাকে এই প্রথম নার্ভাস লাগল—‘আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম’।

‘কেন?’

‘কেন মানে?’ তিনি রাগতস্বরে বললেন—‘একটা খুনী ভোজালি নিয়ে আমার উপরের ফ্লোরের একজনকে খুন করে গেল, আর আমি ভয় পাবো না?’

‘নিশ্চয়ই পাবেন’। অধিরাজ শান্ত অথচ দৃঢ় স্বরে বলে—‘ভয় পাবেন অবশ্যই। কিন্তু ভয়টা তখনই পাবেন যখন জানতে পারবেন যে ওপরের ফ্ল্যাটে একটা খুন হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরে না গিয়েই কী করে জানতে পারলেন যে প্রিয়মের বাবা খুন হয়েছেন?’

বিপুলবাবুর গলার হাড় নড়ে উঠল। যেন কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে বললেন--‘এত চিৎকার চেঁচামেচি...! রঞ্জিতের চিৎকার...!’

‘চিৎকার চেঁচামেচি তো ও ফ্ল্যাটের দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল বিপুলবাবু। এমন কোনওদিন ছিল কি যেদিন প্রিয়মের বাবা মাতাল হয়ে চিৎকার করতেন না? সেজন্যই তো আপনিই ওনার নামে পরাশরবাবুর কাছে কমপ্লেন করেছিলেন। তবে সেদিন চিৎকার শুনে আচমকা ভয় পেয়ে গেলেন কেন? কী করে চিৎকার শোনামাত্রই বুঝতে

boierpathshala.blogspot.com

পারলেন যে ওপরে খুন হয়েছে? বাকিরা স্পটে দৌড়ে গিয়েছিলেন যেটা সবচেয়ে স্বাভাবিক। এবং গিয়ে ওরা দেখেছিলেন যে খুনটা হয়েছে। আপনি না দেখেই কী করে বুঝলেন?'

বিপুলবাবুর মুখ সাদা হয়ে গিয়েছে। অধিরাজ আরও উত্তেজিত—'রঞ্জিতবাবু মাতাল হয়ে চিৎকার করতে পারতেন। প্রিয়মকে পেটাতে পেটাতে চেঁচাতে পারতেন। বা অন্য কারুর মুন্ডুপাত করে গাল-মন্দ করতে পারতেন! অথবা অসুস্থ হয়ে পড়ে হেল্পের জন্য চেঁচাতে পারতেন! এত কিছু অপশন থাকতে আপনার খুনই মনে হল কেন? এবং আপনি দরজায় ডাব্‌ল্ তালা লাগালেন কেন? বলুন বিপুল বাবু...!

লোকটা এবার পুরো ভেঙে পড়ল! হাহাকার করে বলে উঠলেন বিপুলবাবু—'কারণ সকলের আগে আমিই ছুটে গিয়েছিলাম! আমিই রঞ্জিতকে খুন হতে দেখেছিলাম! চিৎকার শুনে মনে হয়েছিল হয়তো কিছু হয়েছে। হয়তো প্রিয়ম্‌কে মারধোর করছে। তাই আমি গিয়েছিলাম ওপরে...কিন্তু...গিয়ে দেখলাম একটা লোক রঞ্জিতকে ভোজালি দিয়ে কোপাচ্ছে...আমি ...আমি আর কিছু ভাবতে পারিনি...আর কিছু ভাবতে পারিনি...!'

ভদ্রলোকের মুখে স্পষ্ট আতঙ্ক! অধিরাজ রুদ্ধশ্বাসে জানতে চায়—'খুনীকে দেখেছিলেন?'

'না। কালো হেলমেটে মুখ ঢাকা ছিল'।

'সে আপনাকে দেখেছিল?'

'জানি না! কিচ্ছু জানি না!' কাঁপা গলায় বললেন বিপুল—'কোনমতে কাঁপতে কাঁপতে পালিয়ে এসেছি...! হাত-পা কাঁপছিল। কোনমতে দরজা লক্ করে...!'

আর বলতে পারলেন না তিনি! সে বিভীষিকার কথা মনে করে রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছেন! সত্যি সত্যিই তার হাত-পা কাঁপছে। অধিরাজ কাকাতুয়াটার দিকে তাকায়। সে ঘাড় কাত করে বিপুলবাবুর দিকেই তাকিয়ে আছে। তার মধ্যে কোনও চাঞ্চল্য নেই'।

সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বিপুল রায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—'ঠিক আছে। আর কোনও প্রশ্ন নেই। আপনি আসতে পারেন'।

পিৎজা (পঞ্চম কিস্তি)

অর্নব যখন অফিসে ফিরে এল তখন অধিরাজ আপনমনেই সিসিটিভি ফুটেজ গুলো দেখছে। কম্পিউটারের পর্দায় পরাশরবাবুর ড্রয়িংরুমের দৃশ্য। বিপুলবাবু হাতে কোলার বোতল নিয়ে এলেন। টিভিতে আই এফ এলের খেলা চলছে। পরাশরবাবু ও বিপুলবাবু খেলা দেখছেন। একটু পরেই বিপুলবাবু উঠে চলে গেলেন। ঠিক তার দশ সেকেন্ডের মাথায় গোল হল। সবুজ মাঠে রঙীন জার্সি পরা প্লেয়ারদের উচ্ছ্বাস। দর্শকেরা লাফিয়ে উঠেছে। তাদের আনন্দধ্বনির মধ্যেই শুরু হয়ে গেল খেলা। পরাশরবাবু হাঁ করে খেলা দেখে চলেছেন। কোনও নড়ন চড়ন নেই। একটু বাদেই অবশ্য বিপুলবাবু ফিরে এলেন...!

'স্যার, কী দেখছেন?'

অধিরাজ অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দেয়—'কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর আমার মাথায় যখন ঢোকে না, তখন সেই সব প্রশ্ন আমি নিজেকে বারবার করি অর্নব! এখনও তাই করছি'।

অর্নব চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকায়। কোন্ প্রশ্নের উত্তর স্যার এভাবে খুঁজছেন?

boierpathshala.blogspot.com

ফুটেজটা ফের রিওয়াইন্ড করে সে কী যেন বারবার খুঁজছে। তার চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর! একবার পরাশরবাবুর বাড়ির ফুটেজ দেখছে, পরক্ষণেই পশুপতিবাবুর বাড়ির ফুটেজ চালাচ্ছে। প্রতিটা মুহূর্ত বারবার রি-ওয়াইন্ড করে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করে চলেছে সে। চোখ অর্ধনিমীলিত। অর্নব ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। এ লক্ষণ সে চেনে। স্যার কিছু একটা পেয়েছেন। এবং সম্ভবত এই খুনীর তান্ডবের ওপরে যবনিকা পড়তে বেশি দেরি নেই!

'অর্নব,...' ফুটেজ দেখতে দেখতেই অন্যমনস্ক স্বরে বলল অধিরাজ—' সেদিন যখন পশুপতিবাবু মারা গেলেন, তখন কিছু অস্বাভাবিক লক্ষ্য করেছিলে? এমন কিছু, যেটা ঘটা উচিত ছিল, কিন্তু ঘটেনি—লক্ষ্য করেছ?'

'না তো স্যার!'

'আমার মন বলছে, ঐ সিনে আরও কিছু একটা ঘটার কথা ছিল, কিন্তু ঘটেনি। সেটার উত্তরই খুঁজছি প্রাণপণ!'

অর্নব একটু ভাবে। তার যেন কী মনে পড়ে যায়। সে উত্তেজিত হয়ে বলে—'হ্যাঁ স্যার, অত কান্ড ঘটে গেল। অত চেঁচামেচি হল। কিন্তু পশুপতিবাবুর স্ত্রী একবারের জন্যও বাইরে এলেন না! তাকে তো সিনে দেখাই গেল না! শুধু যখন অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হচ্ছিল ওকে, তখন চুপচাপ উঠে বসলেন'।

'বাঃ!' সপ্রশংস দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় অধিরাজ—'ছেলে দেখছি বড় হয়ে গিয়েছে! ব্রিলিয়ান্ট অর্নব!'

'থ্যাঙ্কস!' লজ্জায় তার কান প্রায় লাল টম্যাটোর মত রাঙা হয়ে উঠেছে—'ওদিকে কাকাতুয়াটার খবর কী? রি-অ্যাক্ট করলো?'

'কাকাতুয়ার কোনও খবর নেই'। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে—'দুটো সম্ভাবনা হতে পারে। হয় এই পাঁচজনের মধ্যে আসল কিলার নেই, যেটা আমার মনঃপূত হচ্ছে না! নয়তো কাকাতুয়াটার অবস্থাও প্রিয়মের মত। সে ও পেছন থেকেই দেখেছে খুনীকে। তাই চিনতে পারেনি'।

'তবে প্রিয়ম্ ওটার দিকে দেখাল কেন স্যার?' অর্নব তর্জনী তুলে ইঙ্গিত করে—'যখন কাকাতুয়াটা কিছুই জানে না, তখন...!'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই কাকাতুয়াটা দুলে দুলে গান গাইতে শুরু করল—'লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া, ধরেছে যে বায়না/ চাই তার লাল ফিতে, চিরুনি আর আয়না/ জেদ বড় লালপেড়ে টিয়ারঙ শাড়ি চাই/ মনভরা রাগ নিয়ে হল মুখভারি তাই/ বাটাভরা পান দেব, মান কেন যায় না...!'

'হোয়াট দ্য...!' অধিরাজ উত্তেজনায় লাফিয়ে ওঠে—'এই নিয়ে ও এটা দুবার গাইল। যখনই ওর দিকে তর্জনী দিয়ে ইশারা করা হয়, লক্ষ্য করে দেখেছি, ঠিক তখনই ও গানটা গায়! অর্নব...' উত্তেজনায় তার স্নায়ু টানটান হয়ে উঠল—'আরেকবার ওর দিকে ইনডেক্স ফিঙ্গারটা দেখাও তো!'

ফের তর্জনী তুলে কাকাতুয়াটার দিকে দেখায় অর্নব। কাকাতুয়াটা আবার দুলে দুলে গান গাইতে শুরু করেছে—'লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না...!'

'দ্যাট্স ইট!' সে লাফিয়ে ওঠে—'তোমার মনে আছে, প্রথমদিনই প্রিয়ম তর্জনী তুলে ইঙ্গিত করেছিল এটার দিকে। কিন্তু তখন ট্রমাটাইজ্ড্ ছিল বলে পাখিটা গান গায়নি! ওর নাকের সামনে ইনডেক্স ফিঙ্গার তুললেই ও এই গানটা গায়। আর প্রিয়ম্ এটাই শোনাতে চাইছিল!'

'কাকাতুয়ার গান!' অর্নব হতভম্ব—'কিন্তু এর মানে কী?'

'মানে কিছু একটা আছে!' অধিরাজ উত্তেজিত ভাবে বলে—'এটাও একটা অদ্ভুত রহস্য। কিন্তু এবার এটার জবাব

boierpathshala.blogspot.com

খুঁজে পাওয়ার সময় এসেছে। অনেক প্রশ্ন মনে জমেছে অর্নব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তর পেতে হবে! নয়তো পরের খুনটা ঠেকানো যাবে না! একটা বিরাট সিঁড়িভাঙা অঙ্কের মত এই কেসটা। সবক'টা উত্তর যতক্ষণ না মিলছে, ততক্ষণ পরাশরবাবুর ছেলে চরম বিপদে!'

অর্নবের হৃৎপিন্ড নেচে ওঠে। ওদিকে খুনী আরেকটা খুন করার মতলব ভাঁজছে, আর এদিকে স্যার তাকে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কে জিতবে...!

'কিন্তু পরাশরবাবুর ছেলেই কেন? কপিলের বাবাও তো হতে পারে'।

'হতে পারত অর্নব'। অধিরাজ ড্রয়ার থেকে ইন্ডিয়া কিংসের একটা নতুন প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরাল—'কপিল যদি পূর্ণবয়স্ক যুবক না হয়ে একদম বাচ্চা ছেলে হত, তবে হাই চান্স ছিল। কিন্তু খুনী এমন বাচ্চাদের বাবাকে বেছে নিচ্ছে যাদের অত্যাচারিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই। যারা সম্পূর্ণ অসহায়। এখন কপিলের বাবা যদি কপিলকে একটা চড় মারে, তবে কপিল ও বুড়োর দাঁত ভেঙে হাতে ধরিয়ে দেবে। কিন্তু পরাশরবাবুর নাতনি পিঙ্কির সে উপায় নেই। তাই কপিলের বাবা নয়, খাঁড়াটা পিঙ্কির বাবা, আই মিন পরাশরবাবুর ছেলের মাথার ওপরই ঝুলছে!' অধিরাজ উত্তেজিত কন্ঠে বলে—'অর্নব, পিৎজা পার্লারগুলোর খবর কী?'

'এখনও খবর নেই'। সে বলল—'কিন্তু এমন গ্যারান্টি তো নেই যে সে বারবার পিৎজা কর্নার থেকেই পিৎজা নেবে! অন্য পার্লার থেকেও তো নিতে পারে স্যার'।

'নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু সাইকো কিলারদের একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে অর্নব। ওরা কখনই নিজেদের নিয়ম ভাঙে না'। অধিরাজ আস্তে আস্তে বলে—' লক্ষ্য করো, পরিতোষ দত্ত, রজত গাঙ্গুলির কেসে ও যে পিৎজাটা দেওয়া হয়েছিল সেটাও প্যান পিৎজা উইথ মোজারেলা চিজ টপিংস! প্রিয়মের বাবা ও পশুপতিবাবুর ক্ষেত্রেও সেই একই জাতীয় পিৎজা! আর এই বিশেষ পিৎজা পিৎজা কর্নারের স্পেশ্যালিটি। সুতরাং ও পিৎজা কর্নার থেকেই পিৎজাটা নেবে'...।

সে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই অর্নবের ফোন বেজে উঠেছে। ওদেরই এক জুনিয়র অফিসারের ফোন। সে তাড়াতাড়ি রিসিভ করে—'হ্যালো'।

ও প্রান্ত থেকে ভেসে এল জুনিয়র অফিসারের উত্তেজিত কন্ঠ—' স্যার, এইমাত্র আলিপুরের লাল গেটের কাছের পিৎজা কর্নার থেকে খবর এল। জনৈক মাঙ্কিক্যাপে মুখ ঢাকা ব্যক্তি ওখান থেকে প্যান পিৎজা উইথ মোজারেলা চিজ টপিংস কিনেছে। লোকটার হাবভাব যথেষ্টই সন্দেহজনক বলে জানিয়েছে দোকানি। কী করব স্যার?'

উত্তেজনায় অর্নবের হৃৎপিন্ড ধ্বক্ করে ওঠে। সে তাড়াতাড়ি অধিরাজকে সব বলল। অধিরাজ বেশ কিছুক্ষণ অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে—'যেতে দাও। পিৎজা কেনা কোনও ক্রাইম নয়'।

'কিন্তু স্যার লোকটা যদি পালিয়ে যায়?'

'কোথাও পালাবে না'। তার কন্ঠস্বর আত্মবিশ্বাসী—'আমাদের শুধু এইটুকু জানার ছিল যে সে আবার পিৎজা কিনছে কি না। এখন তাকে ধরতে গেলে মানহানির মামলায় ক্ষতিপূরণ দেওয়া ছাড়া অপশন নেই। তাছাড়া পাবলিক প্রসিকিউটারকে কী জবাব দেব? আবার পিৎজা কিনছে, অর্থাৎ আবার খুন করবে। ওটাই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ! ওকে ধরতে হবে ইন অ্যাকশন! কট্ ইন রেড হ্যান্ডেড'।

যদিও স্যারের কথাটা বিশেষ মনঃপূত হল না অর্নবের। তবু সেই নির্দেশ দিয়ে দিল ফোনের ওপ্রান্তে থাকা অফিসারকে। ফোনটা কেটে সে অধিরাজের দিকে তাকায়। অধিরাজ তখন মুচকি মুচকি হাসছে! অর্নব তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই বলল—'লোকটার বুকের পাটা আছে। একবার আমাদের চোখের সামনে দিয়ে খুন করে বেরিয়ে গিয়ে ওর কনফিডেন্স বেড়ে গিয়েছে। ভাবছে এবারও বাজিমাত করবে'।

boierpathshala.blogspot.com

‘সত্যিই যদি তাই হয় স্যার!’ অর্নব আমতা আমতা করে—‘গতবারও তো কিছু বোঝার আগেই...’।

‘গতবারের সঙ্গে এবারের দুটো পার্থক্য আছে অর্নব’। সে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বলে—‘গতবার আমরা জানতাম না যে খুন কে হতে চলেছে বা খুনটা কে করবে। কিন্তু এবার দুটোই জানি!’

অর্নবের বুকের ভেতরে যেন আস্ত একটা জেনারেটর ধপ্ ধপ্ করে চলতে শুরু করল! কী বললেন স্যার! কে খুন করবে সেটাও জানেন! তবে কি পরিসমাপ্তি খুব কাছেই?

‘শুধু এখন কয়েকটা অঙ্ক মেলাতে হবে’। অধিরাজ এসিটা বন্ধ করে দিয়ে বলে—‘কিছুক্ষণের জন্য আমায় একটু একা ছেড়ে দাও। আর লক্ষ্য রেখো, কেউ যেন এখন এ ঘরে না আসে। লিভ্ মি অ্যালোন!’

ইতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল অর্নব। সে জানে এখন এ ঘরে কী হবে! স্যার কখনও পায়চারি করবেন, কখনও অর্ধমুদিত নেত্রে বসে থাকবেন। একের পর এক পুড়বে সিগারেট। ঘরে তামাকপোড়া ধোঁয়ার চোটে টেঁকা যাবে না! এটাই তার ভাবার অভ্যেস! অথবা মগজাস্ত্রকে সক্রিয় করে তোলার পদ্ধতি!

৯.

অপরাধীর ডায়েরি

টু বি অর্ নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন!

সমস্ত পিৎজা কর্নারে সাদা পোষাকের পুলিশ বসেছে দেখছি। এত বুদ্ধিহীনও নই যে সাদা পোষাকের পুলিশ দেখলেও চিনতে পারব না। কিন্তু তবু আমাকে পিৎজা কেনা থেকে ঠেকাতে পারল কই? আমি দিব্যি ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে কাজ হাসিল করে বেরিয়ে এলাম। আমার ভয় কী? যদি ওরা আমাকে ধরেও ফেলত তবু উত্তর তো জিভের ডগায়ই ছিল। কেন? পিৎজা কেনা কী অপরাধ? নিজে খাবো বলে কিনছি। শুধু একটা পিৎজা কিনলেই প্রমাণ হয়ে যায় যে আমি খুনী? মামাবাড়ির আবদার! কেন? বিতস্তা টাওয়ারে আর কেউ বুঝি পিৎজা কেনে না?

পিৎজা আমার বড় প্রিয়। ছোটবেলায় অবশ্য তেমন খেতে পারিনি। তখন তো ঐ অসভ্য লোকটার জ্বালায় দুবেলা দু মুঠো ভাতও জুটত না। অনাথ আশ্রমে যাওয়ার পর সিস্টাররা আমার জন্মদিনে প্রথম পিৎজা বানিয়ে খাওয়ান। এক ইটালিয়ান সিস্টার ছিলেন, যিনি চমৎকার পিৎজা বানাতে পারতেন। সেই প্রথম আমার পিৎজা খাওয়া। স্বাদটা আজও জিভে লেগে আছে। প্যান পিৎজা উইথ মোজারেলা চিজ টপিংস! সেই প্রথম আমার জন্মদিনে সেলিব্রেশন হল। সেই প্রথম বুঝলাম, আমি স্পেশ্যাল। সেই প্রথম স্নেহ ও ভালোবাসার অদ্ভুত বহিঃপ্রকাশ আমাকে ছুঁয়ে গিয়েছিল পিৎজার মাধ্যমে। পিৎজা তাই আমার কাছে শুধু খাবার নয়, বরং একটা আরামের প্রলেপ। পিৎজা দেখলেই মনে পড়ে যায় সেই ইটালিয়ান সিস্টারের কথা। একদম চিরন্তন মাতৃমূর্তি। পিৎজা দেখলে মনে হয়, কেউ আছে আমার যন্ত্রণায় মলম লাগানোর জন্য। পিৎজা মানে স্নেহ, পিৎজা মানে ভালোবাসা, মায়া, মমতা!

আজ রাতের কাজটাই আপাতত আমার ধ্যান জ্ঞান। পিঙ্কিকে কাল ওর বাবা বেল্ট দিয়ে খুব মেরেছে। বাচ্চাটা একটা খেলনা দেখে বায়না করেছিল। সেইজন্যই এমন শাস্তি! অবাক লাগে আমার! ভারি অবাক লাগে! সচরাচর কন্যাসন্তানের প্রতি বাবাদের একটু দুর্বলতা থাকে। মেয়ে মানে ছোট্ট মা! নিজের রক্তের ধন। যে কোনও মেয়ে যে পুরুষটিকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করে সে হল তার বাবা। কারণ সে জানে, এই পুরুষটি তাকে সবরকম দুর্দৈব, সবরকম যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করবে! কতবড় জানোয়ার হলে তারও গায়ে হাত তোলা সম্ভব! আর বাচ্চাগুলোর

boierpathshala.blogspot.com

মায়েদেরও দোষ আছে। মার খেয়ে মরবে, তবু কিছুতেই জানোয়ারগুলোকে ছেড়ে যাবে না! পতি পরম গুরু হলেও তার ঘুঁষি লাথি খেয়ে মরতে হবে, এমন কথা কোন্ শাস্ত্রে লেখা আছে! সব নাকি আধুনিক মেয়ে! এখন অনেক রকম আইন বেরিয়েছে। আছে ফোর নাইন্টি এইট এ'র রক্তচক্ষু! তা সত্ত্বেও এরা আর মধ্যযুগ থেকে বেরোতে পারল না। যেমন পারেনি আমার মা!

ঠিক আছে, মা পারেনি তো কী? আমি এখনও বেঁচে আছি। মারের জবাব মারে দেব। সব বিরাট বিরাট পুরুষসিংহ। বৌ-সন্তানকে পিটিয়ে ভাবে মস্ত কাজ করেছে! কিন্তু সেই একই মার নিজেরা সহ্য করতে পারে না! যখন মনে পড়ে যায় প্রিয়মের বাপ কীরকম শূলবিদ্ধ শুয়োরের মত চিৎকার করছিল, কিংবা পশুপতি শেষমুহূর্তে যন্ত্রণায় কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছিল, তখন অদ্ভুত একটা তৃপ্তি পাই। ওদের রক্ত দেখে, ওদের চোখে মৃত্যুভয় দেখে মনে হয় জীবন সার্থক! পুলিশ তো কম চেষ্টা করল না! আমাকে থামাতে পারল কই! পুলিশ কোনওদিন এই জানোয়ারগুলোকে অত্যাচার করা থেকে থামাতে পারেনি। আমাকেও শোধ তোলা থেকে থামাতে পারবে না!

কিন্তু তা সত্ত্বেও 'টু বি অর্ নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন!' বিতস্তা টাওয়ারে পুলিশের প্রহরা ক্রমাগতই বাড়ছে! ওদের মুঠো আরও টাইট হচ্ছে। ওরা পুরোপুরি সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেওয়ার আগেই এই শেষ কাজটা আমায় সারতেই হবে। মাঝেমধ্যেই দ্বিধা এসে থামিয়ে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় খুনটা কি করা উচিত? যদি পুলিশ অ্যালার্ট হয়ে যায়! যদি আমায় ধরে ফেলে? ইতিমধ্যেই সাদা পোষাকের পুলিশ ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে! এখন কাজটা করা রিস্কি।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় পিঙ্কিকে মুক্তি দিতে হবে। আর কতদিন ওর কষ্ট দেখব? আর কতদিন ও আমার মতই অসহায় ভাবে মার খেয়ে যাবে? যেমন আমি খেতাম... সেই লোকটার হাতে...!

ঐ লোকটাকেও খুন করার খুব ইচ্ছে ছিল। যদি ও জেলে না যেত, তবে বোধহয় ওর মাথায় আস্ত একটা পাথর তুলে বসিয়ে দিতাম। অথবা একটা ছুরি দিয়ে ফালাফালা করে কাটতাম! কিন্তু পুলিশ ওকে বাঁচিয়ে দিল। তবু ওঁৎ পেতে বসেছিলাম। যেদিন সাজা কেটে বেরোবে সেদিনই মারব। কিন্তু লোকটা আর বেরোলই না! মদ খেয়ে খেয়ে লিভারটার অবস্থা এমনিতেই খারাপ করে রেখেছিল। জেলে কয়েকবছর কাটতে না কাটতেই মরে গেল! আমি তবু ওর লাশটাকে দেখিনি। মুখাগ্নি করিনি! ঘেন্না...অসম্ভব ঘেন্না ছিল! এই লোকটার জন্য আমার অমন সুন্দর মা জ্যান্ত পুড়ে কাঠ হয়ে গেল! মুখাগ্নি আর শ্রাদ্ধ করে ওর স্বর্গে বাতি দেব আমি! ওর আত্মার শান্তির বন্দোবস্ত করব! অসম্ভব!

লোকটার মৃত্যুর পর আমার প্রতিশোধস্পৃহা, জিঘাংসা কমে যাওয়া উচিত ছিল! ডাক্তারবাবুরা, সিস্টাররা বোঝাতেন—'মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দাও। তোমার এই জ্বালা, যন্ত্রণাও কমে যাবে। শান্তি পাবে'। কিন্তু আমার শান্তির দরকার ছিল না! বুকের ভিতরে যে অনির্বাণ জ্বালা জ্বলছে, তা ক্ষমায় কমত না! প্রতিশোধে কমত। কিন্তু লোকটাকে পাব কোথায়? সে তো মরেই গিয়েছে! প্রতিশোধের আশ আর আমার মিটল না!

আমি ভেবেছিলাম লোকটা মরে গেছে! ভুল...ভুল ভেবেছিলাম! ঐ লোকটাকে এখনও দেখতে পাই আমি! পরিতোষ দত্ত, রজত গাঙ্গুলির মধ্যে ওকে দেখেছি। প্রিয়মের বাবা, রিকুর বাবার মধ্যেও ছিল ঐ হারামজাদা! ওরা মরে না...কোনওদিন মরে না! শুধু রূপ বদলায়! পরিতোষ দত্ত, রজত গাঙ্গুলি নিজের পরিবারকে চাপে রেখে পৌরুষের গর্ব করত! আসলে ওরা নয়, ওদের মধ্যে ঐ লোকটাই গর্ব করত। ভাবটা এমন—'প্রত্যেকবারই আমি এমন করে মারব। তুই কী করবি?'

আমি কী করব দেখিয়ে দিয়েছি। আমি কী করতে পারি তা ওরা স্বচক্ষে দেখেছে! তারপরও ওদের এত সাহস আছে যে ফের পিঙ্কির বাবার রূপ ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়ায়! আমার চোখের সামনে আবার অসভ্যতামি করে! এত বড় সাহস ওদের!

নাঃ, টু বি অর্ নট টু বি—আর নয়! আর কোনও দ্বিধা নেই! যতবার ঐ লোকটা জন্ম নেবে, ততবারই ওকে মারব!

boierpathshala.blogspot.com

আজ রাতেই মারব। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না!

আই হেট ইউ...আই হেট ইউ বাবা

#পিৎজা (অন্তিম পর্ব)

এখন গভীর রাত নেমে এসেছে। বিতস্তা টাওয়ারের সব আলো নিভে গিয়েছে। শুধু করিডোরের স্তিমিত আলো কেমন যেন হলুদ ম্যাটম্যাটে বাতাবরণ তৈরি করেছে। করিডোরের আলোগুলো তেমন জোরালো নয়। তা সত্ত্বেও কখনও কখনও এক আধটা ছায়ার চুপচাপ সরে যাওয়া টের পাচ্ছে ওরা! অর্নব জানে ওগুলো সাদা পোষাকের পুলিশের ছায়া। রাতের অন্ধকারেও টহল লাগাচ্ছে তারা।

ঘড়িতে প্রায় রাত একটা বাজতে চলেছে! ওরা কেউ জানে না, আদৌ খুনী আজ আসবে কিনা! হয়তো পুলিশের পাহারা দেখে সতর্ক হয়ে গিয়েছে। হয়তো শেষ মুহূর্তে প্ল্যান অ্যাবর্ট করেছে। অথচ তারা কোন্ অব্যক্ত আশঙ্কায়, অনির্দিষ্টের অপেক্ষায় বিতস্তা থেকে একটু দূরেই গাড়িতে বসে আছে কে জানে! অর্নবের অনেকক্ষণ থেকেই বিরাট বিরাট হাই উঠছে। সারাদিনের দৌড় ঝাঁপের পর শরীরটা একটু আরাম চাইছে। কিন্তু আরাম করার উপায় নেই। কখন, কোন মুহূর্তে কী হবে—কেউ জানে না। অধিরাজ পাশে নাইট ভিশন বাইনোকুলার নিয়ে সতর্ক হয়ে বসে আছে। পাছে তাদের কেউ দেখতে পায় সেই ভয়ে সিগারেটও ধরায়নি। শুধু গত দু ঘন্টা ধরে অন্তহীন প্রতীক্ষা করে চলেছে তারা!

'স্যার, আপনার মনে হয় খুনী আজকেই খুনের চেষ্টা করবে?' অনেকক্ষণ ধরে মশা মারতে মারতে শেষপর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়েই বলে ফেলল অর্নব—'সে কি জানে না যে সাদা পোষাকের পুলিশ টহল লাগাচ্ছে?'

'জানে'। অধিরাজ বলল—'কিন্তু সাধারণ খুনী যেভাবে ভাবে, এ সেরকম ভাবে না! সেইজন্যই তো সকালে ছেড়ে দিলাম। যাতে ওর কনফিডেন্স লেভেলটা আরও বাড়ে। লোকটার চরিত্রে একটাই ত্রুটি। ওভার কনফিডেন্স। সেটা বুঝেই সকালে ছেড়ে দিতে বললাম। ইচ্ছে করেই ওর ভুল বিশ্বাসটায় হাওয়া দিয়ে দিয়েছি। যাতে মনে হয়, যতই পাহারা বসুক, কেউ ওর টিকিটিও ধরতে পারবে না! তাছাড়া লোকটার নির্ঘাৎ ধারণা হয়েছে যে আমরা ওর পিৎজা কেনার খবরটা আদৌ পাইনি। অতএব আমরা যে এখানে ওর জন্যই ওঁত পেতে বসে আছি, তা ও দুঃস্বপ্নেও ভাববে না!'

অর্নব বিস্মিত হয়। সকালবেলায় লোকটাকে যেতে দেওয়াটা সে মনে মনে মেনে নিতে পারেনি। মনে হয়েছিল স্যার ভুল করছেন! কিন্তু এখন মনে হল, হয়তো সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল না!

অধিরাজের কানে লাগানো ব্লু-টুথ সেট কড়কড় করে ওঠে। ওপ্রান্ত থেকে জুনিয়র অফিসারের গলা ভেসে আসে—' কোথাও কোনও সাড়াশব্দ নেই স্যার। কী করব?'

'পরাশরবাবুর ছেলে ফিরেছে কী?'

'এখনও ফেরেনি'।

অধিরাজ একটু ভাবে—'ঠিক আছে। তোমরা রাউন্ড মারা বন্ধ করো'।

'স্যার!' অফিসারটির কন্ঠস্বরে বিস্ময়!

'যতক্ষণ না পরাশরবাবুর ছেলে ফিরছে, ততক্ষণ কিছু হবে না'। অধিরাজ ফিস্‌ফিস্ করে—'নিজের ঘরে ফিরে যাও। কিন্তু অ্যালার্ট থেকো'।

boierpathshala.blogspot.com

‘ওকে স্যার!’

বিতস্তা টাওয়ারের ভিতরে ছায়ামূর্তির চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল। দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসাররা সম্ভবত নির্দেশ মেনে নিয়েছে! একটু আগেই পরাশরবাবুর ফ্ল্যাট থেকে ভায়োলিনের শব্দ ভেসে আসছিল। অধিরাজ মৃদুস্বরে বলেছিল—‘বেঠোফেন!’

অর্নবের কাছে অবশ্য বেঠোফেন আর আমীর খসরু—দুই-ই সমান। তবু রাতের প্রেক্ষাপটে বড় করুণ লেগেছিল সেই আওয়াজ। বেহালার মধ্যে একটা অবদমিত বেদনা আছে। যা প্রকাশ হয়েও হয় না, উৎসারিত হলেও তীব্র নয়। বরং ভীষণ ব্যথাতুর কোমল সেই আবেদন!

এই মুহূর্তে অবশ্য চতুর্দিকে কোনও আওয়াজ নেই। শুধু শিশিরের ‘টুপ-টাপ’ শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটা নরম এবং মিঠে কুয়াশার চাদর বিতস্তার সামনে বিছিয়ে আছে। এই মুহূর্তে গোটা টাওয়ারটাকেই বিরাট দৈত্যের মত লাগছে! যেন এক চক্ষুবিহীন দানব চুপ করে অপেক্ষা করছে কোনও অনির্দিষ্ট ঘটনার! সামনের বাগানের আলোও নিভে গিয়েছে। একটু আগেও গাছের পাতায় হিমশীকরবিন্দু আলোয় ঠিকরে ঠিকরে দ্যুতি ছড়াচ্ছিল। কিন্তু এখন শুধু গাছের ছায়া ছায়া অবয়বই দেখা যাচ্ছে। তারাও যেন স্তব্ধ! স্তম্ভিত! শুধু হিমেল হাওয়া স্পর্শ করে তাদের রোমাঞ্চিত করে তুলছে মাঝেমধ্যে।

এতক্ষণে সিদ্ধেশ্বরের ঘরে আলো নিভল। সম্ভবত সেও বিশ্রাম নিতে গেল। ঘড়ি দেখল অধিরাজ। এখন ঘড়ির কাঁটা দেড়টার দিকে যাচ্ছে! আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কে জানে! পরাশরবাবুর মদ্যপ ছেলে আজ বাড়ি ফিরবে তো...!

ভাবতে না ভাবতেই বাইকের জোরালো শব্দ! তাদের গাড়ির পাশ দিয়েই হুশ করে বেরিয়ে গেল একটা বাইক। আরোহীকে স্পষ্ট দেখার উপায় নেই। অর্নব শুনতে পেল অধিরাজ ফিস্‌ফিস্ করে বলছে—‘পরাশরবাবুর ছেলে ফিরল!’

অর্নবের মনে পড়ে পরাশরবাবু বলেছিলেন তার ছেলের বাইক আছে। সে ছট্‌ফট্ করে ওঠে—‘তাহলে তো স্যার এখনই নামতে হয়’।

‘উঁহু! অপেক্ষা করো’। হিমেল হাওয়ার সঙ্গে ভেসে এল চাপা স্বরের উত্তর—‘এখনও সময় হয়নি। আরেকটু ধৈর্য ধরো’।

আর কত ধৈর্য ধরবে! অর্নব ক্রমাগতই অধৈর্য হয়ে উঠছে। তার ভিতরে একটা দমবন্ধ চাপা উত্তেজনা কাজ করছিল। স্যার এত দেরি করছেন কেন? যদি এর মধ্যেই খুনী তার কাজ শেষ করে চলে যায়? যদি দেরি হয়ে যায়...!

প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে ওরা বসে আছে। এতক্ষণ চাঁদ মেঘের আড়ালে ছিল। এখন পাতলা আস্তরণ সরিয়ে উঁকি মেরেছে! রূপোর একফালির মত শাণিত ফলা নিয়ে আকাশে জ্বলজ্বল করছে। তার পাশাপাশি নক্ষত্রের শান্ত, ঠান্ডা, নীলাভ আলো! চাঁদের আলোয় বিতস্তা টাওয়ারকে অদ্ভুত লাগছিল। মনে হচ্ছিল, এই মুহূর্তে এই প্রকান্ড বাড়িটা নিঃসঙ্গ। তার বিশাল দেহ জ্যোৎস্নায় চকচক করছে। মাঝেমাঝে দমকা হাওয়া লুটোপুটি খাচ্ছে তার মজবুত দেহে। শিশিরের শব্দ কীসের যেন ইশারা করছে—‘টপ্ টপ্...টপ্ টপ্...!’

পরাশরবাবুর ছেলেকে এখন বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে! সে গ্রাউন্ড ফ্লোরে নিজের বাইক পার্ক করে এখন উপরের রাস্তা ধরেছে! নেশায় প্রায় টালমাটাল অবস্থা। কিন্তু জাতে মাতাল তালে ঠিক। হাতে বাইকের চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে মহা ফূর্তিতে সিটি দিচ্ছে।

‘চলো অর্নব’।

boierpathshala.blogspot.com

অধিরাজ প্রায় সরীসৃপের মত গুঁড়ি মেরে নামল। এখন পরাশরবাবুর ছেলের থেকে সে নিরাপদ দূরত্বে। চাপা গলায় বলল—'ছেলেটার পেছন পেছন চলো। কিন্তু দেখো কোনও পার্টি যেন টের না পায়'।

'ওকে স্যার'।

অর্নবও গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। একবার আলতো করে কোমরের বেল্টে আটকানো আগ্নেয়াস্ত্রকে স্পর্শ করল। বলা যায় না! আজ দরকার পড়তে পারে।

যাকে রক্ষা করার জন্য এতকিছু তার কিন্তু কোনওদিকেই খেয়াল নেই। সে দিব্যি নিশ্চিন্তে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছে। মনের আনন্দে গানও গাইছে! তার থেকে কয়েকগজ দূরত্বেই যে দুটো লোক সন্তর্পণে তাকে ফলো করে চলেছে, সেদিকে খেয়ালই নেই!

'ঝুঁটি বাঁধা কাকাতুয়া আয় না

ধরেছে খোকন সোনা বায়না...'

উপরের দিকে উঠতে উঠতেই চমকে উঠল অর্নব। উল্টোদিক দিয়েও একটা শিসের আওয়াজ ভেসে আসছে! কেউ সিঁড়ির ওপরের দিক থেকে শিস দিচ্ছে!

'স্যার!'

'চুপ! কোনও কথা নয়'। অধিরাজ হাতের ইশারায় তাকে সতর্ক থাকতে বলল। অর্থাৎ এখন যে কোনও মুহূর্তে খুনী তাদের সামনে এসে পড়তে পারে। সে ব্লুটুথের মাধ্যমে ওপরে থাকা জুনিয়র অফিসারকে ধরে—'শিসের শব্দটা শুনতে পাচ্ছ?'

'ইয়েস স্যার'।

'কোথা থেকে আসছে?'

'আমাদের নীচের ফ্লোর থেকে'। ও প্রান্ত থেকে জবাব এল—'নামব?'

'নেমে এসো। তবে সাবধানে। টের যেন না পায়'।

'ওকে'।

পরাশরবাবুর ছেলে ততক্ষণে বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। অর্নবের কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। এই নিঃসঙ্গ সিঁড়িতে শিসের আওয়াজটা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে কেমন যেন গা শিরশিরে অনুভূতি তৈরি করছে! সিটির আওয়াজটা ক্রমশই কাছে আসছে...এল...আরও কাছে এল... এসে পড়ল...!

ছেলেটা ততক্ষণে কয়েকধাপ সিঁড়ি ভেঙে নিজের ফ্ল্যাটের মুখটাতে প্রায় পৌঁছেই গিয়েছে। আচমকা কোথা থেকে একটা মাঙ্কিক্যাপ পরা লোক তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল! অর্নব সভয়ে দেখল লোকটা বিদ্যুৎগতিতে ছেলেটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে মেঝের ওপর...সেকেন্ডের ভগ্নাংশে তার হাতে কী যেন উঠে এল... বিতস্তার করিডোরের স্তিমিত আলোতেও ঝিকিয়ে উঠল হাতে ধরা জিনিসটা...বিস্ফারিত দৃষ্টিতে অর্নব দেখল একটা বিরাট ছোরা...! ছেলেটা ভয়ের চোটে আর্তনাদ করে উঠেছে...!

'হাতের ছুরিটা ফেলে দিন পরাশরবাবু'।

পিছন থেকে ইস্পাত কঠিন কন্ঠস্বর ভেসে এল। অধিরাজের হাতে তখন উঠে এসেছে বন্দুক। সেটা মাঙ্কিক্যাপ

boierpathshala.blogspot.com

পরা ব্যক্তির দিকে তাক্ করে বলল—'আপনার হেলমেট কিংবা মাঙ্কিক্যাপ—কোনটাই আপনার পরিচয় ঢেকে রাখতে পারেনি। হাতের ছুরিটা ফেলে দিন। আপনাকে এখন দুদিক দিয়েই পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। উপায় নেই!'

পরাশরবাবু! ঐ সদাহাস্যময় নিরীহ লোকটা! অর্নবের মাথায় যেন গোটা আকাশটা ভেঙে পড়ে! শেষপর্যন্ত কিনা পরাশর চৌধুরী...! বিতস্তার সেক্রেটারি! লোকটা নিজের ছেলেকেই মারতে যাচ্ছিল...!

পরাশরবাবু হাতের অস্ত্রটা নামিয়ে রেখেছেন। এবার মাঙ্কিক্যাপ সরিয়ে মৃদু হাসলেন। ঠান্ডা গলায় বললেন—'বড় ভুল সময়ে এলেন অফিসার। আর পাঁচ মিনিট পরে এলেও আমায় ধরতেন ঠিকই! কিন্তু এই কুলাঙ্গারটা বেঁচে থাকত না! এই একটাই আফসোস রয়ে গেল...!'

ততক্ষণে উপরতলা থেকে নেমে এসেছে পুলিশবাহিনী। পরাশরবাবুর ছেলের বোধহয় সব নেশাই এক ধাক্কায় কেটে গিয়েছে। কোনওমতে জড়ানো গলায় বলল—'বাবা! তুমি...!'

'চো-ও-প!' অপ্রকৃতিস্থ অথচ হিংস্র গলায় বললেন তিনি—'আমি তোর বাবা হতেই পারি না! নিজে ছোটবেলায় অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি। আমার বাপটা ছিল রাক্ষস! কিন্তু তোর সঙ্গে তো আমি কোনওদিন খারাপ ব্যবহার করিনি! বুকে করে তোকে মানুষ করেছি! যতভাবে যত্ন করা যায়, যতরকম আদর, স্নেহ, ভালোবাসা—কিচ্ছু বাকি রাখিনি! আমি যা পাইনি, সব তোকে ঢেলে দিয়েছি! তবে তুই ঐ রাক্ষসটার মত কেন হলি? অ্যাঁ! তুই আমার ছেলে না!...তুই সেই লোকটার নোংরা রক্ত...সেই লোকটা...সেই লোকটা...!'

বলতে বলতেই যেমন আচমকা ফুঁসে উঠেছিলেন ভদ্রলোক, ঠিক তেমনই হঠাৎ করে শান্ত হয়ে গেলেন। ভেঙে পড়া, বিধ্বস্ত গলায় বললেন—'আমায় অ্যারেস্ট করুন অফিসার! নয়তো এই রাক্ষসটাকে আমি মেরে ফেলব...ধরা পড়ায় আমার কোনও আফসোস নেই। ধরা তো একদিন পড়তেই হত। আগের সমস্ত খুনগুলোও আমিই করেছি। খুনগুলো করার জন্যও কোনও অনুতাপ নেই...শুধু একটাই আফসোস!...পিঙ্কিকে বাঁচাতে পারলাম না! যদি আপনি আর পাঁচ মিনিট দেরি করে আসতেন!...আর পাঁচটা মিনিট...!'

১০.

'হরি হরয়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ

যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ...'

ডঃ চ্যাটার্জীর ল্যাবে এখন একটা কাকাতুয়া দুলে দুলে গান গাইছিল। নাঃ, এটা প্রিয়মদের কাকাতুয়াটা নয়। প্রিয়মদের কাকাতুয়াটা আপাতত বাড়ি গিয়েছে। তবে ঘন্টু খবরি তার কথা রেখেছে। সে একটা কাকাতুয়া এনে দিয়েছে অধিরাজকে। সে সেটাই গিফ্‌ট করেছে ডঃ চ্যাটার্জীকে। ডঃ চ্যাটার্জী প্রথমে তার স্বভাবমতই কেঁউমেউ করছিলেন। কিন্তু অধিরাজের অকাট্য যুক্তি—'দিনরাত মড়াদের সঙ্গে থেকে থেকে আপনি ক্রমাগতই খেঁকুটে হয়ে যাচ্ছেন। অন্তত কথা বলার জন্য একটা জ্যান্ত সঙ্গী দরকার!'

অগত্যা! তাই এখন কাকাতুয়াটা ডঃ চ্যাটার্জীর নতুন সঙ্গী হয়েছে। ডঃ চ্যাটার্জী তার নাম রেখেছেন দ্রিঘাংচু। সে প্রায়ই ডায়লগ মারে—'আসুন, বসুন, চা খাবেন?' ইত্যাদি। আবার মুড ভালো থাকলে গানও গায়। এখন যেমন তারস্বরে গাইছে—'হরি হরয়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ/ যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ...!'

'ওঃ!' ডঃ চ্যাটার্জী মহাবিরক্ত হয়ে ওঠেন—'এই বৈষ্ণব, বিনয়ের নলকূপের চোটে যে কান গেল! ওরে দ্রিঘাংচু,

boierpathshala.blogspot.com

একটু চুপ কর্। যাদবায় মাধবায়'র চোটে আর যে পারি না! কী কুক্ষণে যে এই গানটা শিখিয়েছিলাম!'

'আপনিও আশ্চর্য!' তার সামনে হাত পা ছড়িয়ে বসেছিল অধিরাজ। হেসে বলল—'আপনাকে টাকলু বললেও বিপদ! যাদবায় মাধবায় গাইলেও বিপদ! কী করলে আপনি খুশি হবেন বলতে পারেন?'

'এই কাকাতুয়া অত্যন্ত গোলমেলে প্রাণী। দরকার কী ছিল এই পাখিটাকে আনার?' ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ কাঁচুমাচু মুখে বললেন—'কোনও সাইলেন্ট জীব পাওয়া গেল না! যেমন খরগোশ-টরগোশ...!'

'কাকাতুয়াকে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না'। অধিরাজ হাসতে হাসতেই বলে—'এই কেসে প্রিয়মদের কাকাতুয়াটা না থাকলে হয়তো কেস সল্‌ভই হত না'।

'কী রকম?' তিনি ছেলেমানুষের মত হাত উল্টেছেন—'আমি তো মাথামুন্ডু কিছুই বুঝলাম না'।

'বোঝেননি?' সে মিটমিট করে হাসে—'আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি। আমি যখন প্রিয়ম্‌কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম লোকটা হেলমেট খোলার পরে কী করেছিল, তখনই ও তর্জনী তুলে কাকাতুয়াটাকে দেখায়। প্রিয়ম্ ইশারা, ইঙ্গিতে কথা বলে। খুনী যে হেলমেট পরেছিল তা সে হেলমেট পাওয়ার রেঞ্জারের ফিগারিন দেখিয়ে জানিয়েছিল। তখনই মনে হয়েছিল কাকাতুয়াটার মাধ্যমে সে কিছু বলতে চায়। কিন্তু কী বলতে চায় সেটাই বুঝতে পারছিলাম না। পরে বুঝলাম আসলে ইনডেক্স ফিঙ্গার বা তর্জনী দেখালেই ব্যাটা একটা গান গায়। প্রিয়ম্ ঐ গানটাই শোনাতে চাইছিল!'

'কিন্তু সে গান তো আমরা সবাই শুনেছি! আমাদের মাথায় তো কিছুই ঢুকল না!'

অধিরাজ ফিক্ করে হেসে ফেলে—'স্বাভাবিক! কারণ গানটা ছিল 'লাল ঝুঁটি কাকাতুয়া ধরেছে যে বায়না/ চাই তার লাল ফিতে, চিরুনি আর আয়না!' এগুলো সব কেশ প্রসাধনীর জিনিস! ফিতে, চিরুনি, আয়নার মাহাত্ম্য যে আপনার মাথায় ঢুকবেনা সেটাই তো স্বাভাবিক! কিন্তু এই শব্দগুলোর মধ্যেই প্রিয়মের বক্তব্য লুকিয়েছিল। আমি জানতে চেয়েছিলাম হেলমেট খোলার পর খুনী কী করেছিল। প্রিয়ম এই গানটার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছিল যে খুনী চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়েছিল। আর এখানে একটি ব্যক্তিরই বদভ্যাস আছে কথায় কথায় চুল আঁচড়ানোর। পরাশর চৌধুরী। উত্তেজিত হলেই উনি ঘন ঘন চুল আঁচড়ান। সেদিন খুন করার পরেও উনি চিরুনি দিয়ে অভ্যাসবশত নিজের কেয়ারিটিকে ঠিক করছিলেন। সেটাই চোখে পড়ে গিয়েছিল প্রিয়মের! সুতরাং কাকাতুয়াটার গানের মধ্যে একটা বিরাট ক্লু লুকিয়েছিল'।

'শুধু গান শুনেই বুঝলে? বাপ্ রে!'

'অব্‌ভিয়াসলি না'। অধিরাজ বলল—'সত্যি বলতে কী পশুপতিবাবুর মৃত্যুর পরই পাঁচজনকেই সন্দেহ করতে শুরু করি। কিন্তু ডঃ তেজেন বর্মন আর পরাশরবাবুর ওপর সন্দেহটা বেশি ছিল। কারণ পিৎজা কর্নারের ফুটেজ দেখেই বুঝতে পারি যে কিলার আর যাই হোক্ হেলমেট পরতে অভ্যস্ত নয়। অথচ এত কিছু থাকতে হেলমেটের কনসেপ্ট তার মাথায় এল কী করে? মুখ ঢাকার আরও অনেক রাস্তা আছে। মুখে শাল, বা চাদর জড়ানো যেত, কিংবা পরে যেটা করেছিলেন পরাশরবাবু, সেই মাঙ্কিক্যাপও পরে কাজ সারতে পারত। কিন্তু হেলমেট কেন? নিশ্চয়ই কোনও না কোনওভাবে সে বাইকের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু নিজে বাইক চালায় না! কপিল মিশ্র, অমিত মুখার্জী এবং বিপুল রায় নিজেরাই বাইক চালান। সুতরাং অমন আনাড়ির মত হেলমেট পরবেন না, যদি না পুলিশকে বিভ্রান্ত করার ইচ্ছে থাকে। রইল বাকি দুই। ডঃ তেজেন বর্মন এবং পরাশর চৌধুরী। এদের বাড়িতে বাইক আছে—কিন্তু ওরা নিজেরা চালান না। ওদের ছেলেরা চালায়। তাই ডঃ বর্মন আর পরাশরবাবুকে সাসপেক্টের লিস্টে প্রথম দিকে রেখেছিলাম। কপিল মিশ্রকেও সন্দেহ হয়েছিল। ও যেমন অস্বাভাবিক স্বভাবের তাতে ওকেই সাইকো ভেবে বসাটা আশ্চর্য নয়! কিন্তু তারপরই আপনি একটি মোক্ষম লিড দিলেন'।

'আমি!' চোখ কপালে তুলে বললেন ডঃ চ্যাটার্জী—'আমি আবার কী বললাম?'

boierpathshala.blogspot.com

‘কেন? ঘোড়ার লেজের চুলের লিডটা তো আপনারই ছিল!’

‘তাতে কী? পরাশরবাবুর সঙ্গে তো ঘোড়ার দূরদূরান্ত অবধি কোনও সম্পর্ক দেখছি না!’

‘আছে ডক্’। অধিরাজ বলল—‘শুধু আপনি আর আমি প্রথমে রেসের ঘোড়া, পোষা ঘোড়া, জকি-টকি নিয়ে ভুল ট্র্যাকে যাচ্ছিলাম বলে বুঝতে পারিনি। তখন মাথায় আসেনি যে ঘোড়ার লেজের চুলটা কোনও জ্যান্ত ঘোড়া থেকে নাও আসতে পারে!’

‘তবে এল কোথা থেকে?’

‘স্ট্রিং ইন্সট্রুমেন্ট থেকে’। সে বুঝিয়ে বলে—‘সিদ্ধেশ্বর বলেছিল পরাশরবাবু ভায়োলিন, চেলো, এস্রাজ বা দিলরুবা বাজান। রোজ বিকেলে রেওয়াজ করেন। আমরা পশুপতিবাবুর বাড়িতে তার বাজনা শুনেছিলাম। কাল রাতেও শুনেছি। ঘোড়ার লেজের চুলটা ওখান থেকেই এসেছিল। আপনি হয়তো জানেন না, ভায়োলিন, চেলো, এস্রাজ বা দিলরুবার যে ‘বো’ থাকে, তাতে সাদা সাদা একগুচ্ছ তারের মত যে জিনিসটা দেখা যায়, আসলে সেটা কোনরকম তার বা মেটাল নয়, সাদা ঘোড়ার লেজের চুল। এই তথ্যটা জানতাম। কিন্তু প্রথমে মাথায় আসেনি। পরে যখন এল, তখনই পরাশর বাবুর ওপর সন্দেহটা আরও জোরদার হল। তাছাড়া পশুপতিবাবুর বাড়িতেও সেদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল। আমি বারবার অর্নবকে বলছিলাম, সেদিন ওখানে কিছু হওয়ার ছিল—অথচ হয়নি’।

‘কী হয়নি শুনি?’

‘যখন পশুপতিবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন সকলেরই রি-অ্যাকশন পাওয়া গিয়েছিল। একমাত্র পাওয়া যায়নি পশুপতিবাবুর কুকুর পলের রি-অ্যাকশন। অথচ সেটাই স্বাভাবিক ছিল। সচরাচর প্রভু অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথম রি-অ্যাক্ট করে তার পোষা প্রাণী। প্রিয়মের বাবার খুন হওয়ার সময়ও তার পোষা প্রাণীরা চিৎকার চেঁচামেচি করেছিল। কিন্তু সেদিন পল্ টুঁ শব্দটিও করেনি। কেন? এই প্রশ্নটাই বারবার আমায় তাড়া করছিল। তাই সেদিনের সিসিটিভি ফুটেজ দেখছিলাম। ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বুঝলাম পল্ পরাশরবাবুর কোলে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অথচ তার আগে পর্যন্ত সে সবাইকে দাঁত খিঁচিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাহলে হঠাৎ তার এরকম শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার কারণ কী? তখনই বুঝলাম কেসটা কী। পরাশরবাবু তাকে কোলে নিয়েছিলেন। ঠিক তার আগেই নিজের বাড়িতে সুযোগ বুঝে কোলার বোতলে ক্লোরোফর্ম ঢেলে, বোতলটা পালটে এসেছিলেন। ক্লোরোফর্ম তখনও তার হাতে লেগেছিল। মানুষের ঘ্রাণশক্তিতে সেই গন্ধ পাওয়া মুশকিল। কিন্তু পলের ঘ্রাণশক্তি অনেক বেশি। সে ক্লোরোফর্মের মিষ্টি গন্ধটা পেয়েছিল। এবং সেই গন্ধের নেশাতেই আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল’।

‘কিন্তু কোলার বোতলটা পাল্টাল কখন? নিজের বাড়িতেই?’ ডঃ চ্যাটার্জী জানতে চাইলেন—‘তবে সেটা সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়ল না কেন?’

‘সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছিল ঠিকই। কিন্তু ফুটেজটাকে এডিট করা হয়েছে’। অধিরাজ সিসিটিভি ফুটেজটা ডঃ চ্যাটার্জীর কম্পিউটারে চালাল—‘দেখুন, এর মধ্যে কোনও অসঙ্গতি পাচ্ছেন?’

কম্পিউটারে ভেসে উঠল পশুপতিবাবুর মৃত্যুর দিনের ফুটেজ। বিপুল রায় কোলার বোতল নিয়ে পরাশরবাবুর বাড়িতে এলেন। দুজনে বসে আই এফ এলের ম্যাচ দেখছেন। তার মধ্যেই বিপুল রায় উঠে গেলেন। পরাশরবাবু একাই ম্যাচ দেখছেন। গোল হল। মাঠে উচ্ছ্বাস! খেলোয়াড়রা একে অপরকে জড়িয়ে ধরছে। তারপরই আবার খেলা শুরু হল। বিপুলবাবুও ফিরে এলেন।

‘এর মধ্যে অসঙ্গতি কোথায়? সবই তো ঠিকঠাক!’

‘আপনি শিওর! কিছু মিসিং নেই?’

boierpathshala.blogspot.com

‘কী মিসিং থাকবে?’ ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ মাথা নাড়লেন—‘আমি তো তেমন কিছু দেখলাম না!’

‘হ্যাঁ! আমিও একটা জিনিস দেখতে পাইনি’। সে সহাস্যে বলে—‘সেটা হল রিপ্লে। আজ পর্যন্ত টিভিতে এমন কোনও ফুটবল ম্যাচ দেখেছেন যেখানে গোল হলে রিপ্লে দেখায় না? গোল হলে ঠিক তার পরেই যে জিনিসটি টিভিতে ভেসে ওঠার কথা, সেটা হল রিপ্লে। গোল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খেলা শুরু হয়ে যায় না। অন্তত গোটা দুয়েক রিপ্লে তে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানো হয় যে ঠিক কীভাবে গোলটা হল। অথচ এই সিসিটিভি ফুটেজে সেই রিপ্লেটাই নেই! স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ হয় যে তাহলে হয়তো মাঝখানের অন্তত ত্রিশ সেকেন্ডের ফুটেজ এখানে নেই। এবং সেই ত্রিশ সেকেন্ডেই বোতলটা বদল হয়েছে। পরাশরবাবু এক সপ্তাহ আগে থেকেই জানতেন যে পরের বৈঠকে বিপুলবাবু ‘জিরো কোলা’ আনবেন। তিনি সেই সুযোগটাই কাজে লাগালেন। জিরো কোলার বোতল কিনে নিয়ে এলেন। কিন্তু সেই বোতলে এনার্জি ফ্রেঞ্জি ঢেলে রেডি করে রাখলেন। সেদিন যেই বিপুলবাবু বাইরে গেলেন অমনি শুধু টুক করে বোতলে ক্লোরোফর্মটা ঢেলে দিয়ে বোতলটা পালটে দিয়েছিলেন। এসব করতে বড়জোর ত্রিশ সেকেন্ড লাগার কথা। সেই ত্রিশ সেকেন্ডের ফুটেজই এখানে নেই। স্বাভাবিক ভাবেই নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলাম এসব পরাশরবাবুর কীর্তি! একমাত্র তার পক্ষেই এ কাজ করা সম্ভব! নিজের বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ ট্যাম্পার একমাত্র তিনিই করতে পারেন। তার ওপর তিনি এ বিল্ডিঙের সেক্রেটারি। সিকিউরিটি কেবিনের চাবির একটা গোছা স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে থাকে। সিকিউরিটি কেবিনে গিয়ে ত্রিশ সেকেন্ডের ফুটেজ কেটে দেওয়া তার বাঁ হাতের খেল’। বলতে বলতেই অধিরাজ একটু থামল—‘তবু একটু কিন্তু কিন্তু ছিল। যদিও কপিল বলেছিল পরাশরবাবু মাঝেমধ্যেই তার ল্যাবে দেখা করতে আসতেন। সেখান থেকে ক্লোরোফর্ম চুরি করা এমন কিছু কঠিন ছিল না। কপিল ভীষণ এলোমেলো লোক। তার ওপর আবার ভুলে যাওয়ার বদভ্যাস আছে। পরাশরবাবু আরামসে ক্লোরোফর্মের বোতল সরাতে পারতেন। তবু অমিত মুখার্জী আর বিশেষ করে বিপুল রায়ের সন্দিগ্ধ ভাবভঙ্গিতে আমি আবার ডাইভার্টেড হয়ে গিয়েছিলাম। তাছাড়া আমরা আন্দাজ করছিলাম যে খুনীর শৈশব খুব খারাপ কেটেছে। তার সমস্ত রাগ, ঘৃণা তার নিজেরই বাবার ওপর। তাই বারবার ‘হেট ইউ বাবা’ শব্দটা লিখছে! কিন্তু পরাশরবাবুর মা-বাবা তো উপস্থিত! তবে? আমার সমস্ত সন্দেহ আবার গিয়ে পড়ল ডঃ তেজেন বর্মন আর কপিল মিশ্র’র ওপরে। কারণ একমাত্র এই দুজনেরই অতীত গোলমেলে। একজন ছোটবেলা থেকে অত্যাচারিত, অন্যজন অনাথ। খুনীর প্রোফাইলের সঙ্গে মেলে। কিন্তু তারপরই ডঃ তেজেন বর্মন জেরার সময়ে এমন একটা কথা বললেন, যার থেকে সব পরিষ্কার হয়ে গেল’।

‘কী বলেছিলেন তেজেন বাবু?’ ডঃ চ্যাটার্জী কাকাতুয়াটাকে আদর করতে করতে প্রশ্ন করেন।

‘ডঃ তেজেন বর্মন বলেছিলেন—“পরাশর আমার বহুবছরের বন্ধু। প্রায় ছেলেবেলা থেকে চিনি’। ডঃ বর্মন পরাশরবাবুকে ছেলেবেলা থেকে চিনলেন কী করে? যদি পরাশরবাবুর বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ স্বাভাবিক ভাবে হয় তবে ডঃ বর্মনের ওনাকে চেনারই কথা নয়। ডঃ বর্মনের ছেলেবেলা কেটেছে অনাথ আশ্রমে। পড়েছেনও অনাথ আশ্রমের স্কুলে। তবে তিনি সেখানে পরাশরবাবুকে পেলেন কোথায়? উত্তরটা এক ও অদ্বিতীয়। পরাশরবাবুর ছেলেবেলাও তবে অনাথ আশ্রমেই কেটেছে। এরপর ডঃ বর্মন বললেন—‘ যদিও মাঝখানে অনেকদিন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু বিতস্তায় আসার পরই ফের দেখা হল’। কেন যোগাযোগ ছিল না? সিম্প্‌ল্‌। সম্ভবত পরাশরবাবুকে কেউ দত্তক নিয়েছিল যার জন্য যোগাযোগ থাকেনি। আর এখন যে বাবা-মাকে আমরা দেখছি, অব্‌ভিয়াসলি তারা পরাশরবাবুর নিজের বাবা-মা নন্‌। সুতরাং একে একে দুই, আর দুয়ে দুয়ে চার!’

‘তোমার দুয়ে দুয়ে চারে দম আছে! আমাদের মাথায় তো এতকিছু আসেনি!’

অধিরাজ মৃদু হাসল। প্রশংসাটা গ্রহণ করে সামান্য মাথা ঝাঁকাল।

‘পরাশরবাবুর এখন কী অবস্থা?’

‘যা হয়ে থাকে। সব কিছুই স্বীকার করেছেন। উনিই প্রিয়মের বাবাকে মেরেছেন, উনিই পশুপতিবাবুকে খুন করেছেন, কপিলের ল্যাব থেকে তার ভুলো মন আর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে ক্লোরোফর্ম চুরি

boierpathshala.blogspot.com

করেছেন—এমনকি পশুপতিবাবু যেদিন খুন হন, সেদিনও ঐ গন্ডগোলের মধ্যে হেলমেট আর লেদার জ্যাকেটটা উনিই আমার গাড়িতে রেখেছিলেন—সব স্বীকার করেছেন। শুধু একটাই আফসোস! পিঙ্কিকে তার বাবার অত্যাচার থেকে বাঁচাতে পারলেন না! এছাড়া কোনও অনুতাপ নেই'। অধিরাজ বিড়বিড় করে—'আইনের চোখে লোকটা খুনী। কিন্তু তবু ওকে ঘৃণা করতে পারছি না...!'

'থাক্! তোমার আর সহানুভূতি দেখিয়ে কাজ নেই। চোর, ডাকাত, খুনীদের প্রতি যদি এত সহানুভূতি থাকে তবে আর দেখতে হবে না! সি আই ডি অফিস স্রেফ মশা আর মাছি মারবে...!'

ডঃ চ্যাটার্জী কথাটা শেষ করার আগেই কাকাতুয়াটা ফের দুলে দুলে গান গাইতে শুরু করেছে—'হরি হরয়ে নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ...'।

তিনি কাকাতুয়াটার দিকে ফিরলেন। একটা লাল টুকটুকে কাঁচালঙ্কা তুলে নিয়ে বললেন—'নে, অনেকক্ষণ ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ধরে গেছে তোর! এবার কাঁচালঙ্কা খা!'

'ক্রক্'। কাকাতুয়াটা ড্যাব্ ড্যাব্ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। পরক্ষণেই বলল—'ধুর্ টাকলু! ঝাল লাগবে না!'

'রা—জা!' ডঃ চ্যাটার্জী রাগে লাল হয়ে বিদ্যুৎবেগে সামনের দিকে ফিরলেন—'ইউ...!'

অধিরাজ ততক্ষণে হাওয়া! সেদিন গোটা অফিসে তাকে আর খুঁজে পাওয়াই গেল না...!

(সমাপ্ত)

boierpathshala.blogspot.com

Scanned with CamScanner

BOOKS IN PDF

To get free e-books

Step 1

Click here

Step 2

Click here

Request or suggest book

boierpathshala.blogspot.com